গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement
বাসা ৫৬০, সড়ক ০৮, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বাজেট পাঠ • বাজেট অলিম্পিয়াড সহায়িকা

বাজেট পাঠ

budget OLYMPIAD বাজেট অলিম্পিয়াড

বাজেট অলিম্পিয়াড সহায়িকা

বাজেট পাঠ

বাজেট অলিম্পিয়াড সহায়িকা

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

প্রকাশক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন প্রকাশনা কমিটি
বাসা ৫৬০, সড়ক ০৮, আদাবর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-বার্তা: democratic.budget@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.democraticbudget.org

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৭

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০১৮

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
নুরুল আলম মাসুদ

নকশা ও মুদ্রণ
রেডলাইন

শুভেচ্ছা মূল্য
কুড়ি টাকা

সহায়তা
একশানএইড বাংলাদেশ

তথ্যসূত্র
এই পুস্তিকাটি সংকলনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বাজেট বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত 'বাজেট কমপেনডিয়াম'; গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন থেকে প্রকাশিত এ. আর. আমান ও নুরুল আলম মাসুদ সম্পাদিত, আবুল কালাম আজাদ ও মোসফিকুর রহমার রচিত বাজেট এনসাইক্লোপিডিয়া, ২০১৫ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাজেট সহায়িকা থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নিঃস্বত্ব
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
এই প্রকাশনাটি যেকোন অবাণিজ্যিক কাজে যেকোন মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে, সূত্র উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

ভূমিকা

জাতীয় বাজেট একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। বাজেটে দেশের এক বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল তুলে ধরা হয়। ফলে কোন দেশের নাগরিকদের জন্য সেই দেশের বাজেট সম্পর্কে জানা ও সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। বাজেট কিভাবে প্রণীত হচ্ছে, বাজেটে কাদের স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে, কতটুকু ক্ষুন্ন হচ্ছে; বাজেটে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি জনগণের জীবনমান পরিবর্তন ও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে কি ধরনের ভূমিকা রাখবে, বাজেট প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু হচ্ছে ইত্যাদি বিষয় জনগণের জানা জরুরি। কারণ বাজেটের অর্থ প্রধাণত জনগণের দেয়া ট্যাক্সের টাকা দিয়েই সংস্থান করা হয়।

আমাদের দেশের তৃণমূলের মানুষ এমনকি উচ্চশিক্ষিত অনেক মানুষও বাজেট বিষয়টি ভালো করে জানেন না বা বোঝেন না এবং বাজেট সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে ও পরে বাজেট বিষয়ে গণমাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখলেও বিষয়টি বেশ বুঝতে পারা যায়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ তরুণ-তরুণী, যাদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫। যুবকরাই সমাজের এবং দেশের অর্থনীতিতে মূল ক্রিড়ানকের ভূমিকা পালন করে। একই সাথে যে কোন নতুন ধারণা-দাবিকে জনসমাজে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তরুণরাই সবার আগে এগিয়ে আসে। শিক্ষা জীবনে তরুণরা অর্থনীতি, রাজনীতিবিজ্ঞান পাঠের অংশ হিসেবে বাজেট বিষয়ক কিছু কিছু বিষয়ের সাথে পরিচিতি লাভ করলেও ছাত্রাবস্থায় তরুণরা ব্যাপকভাবে বাজেট নিয়ে আলোচনা, চিন্তা বা বিতর্কের সুযোগ পায় না।

তাই বাজেট বিষয়টিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আরো বেশি আলোচ্য-আগ্রহের বিষয় করে তোলার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন দেশে প্রথমবারের মত বাজেট অলিম্পিয়াড ২০১৭ আয়োজন করতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন এবং পরবর্তীতে তাদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে; এবং এর মধ্যদিয়ে তরুণরা বাজেট বিষয়ে দৃঢ়ভাবে চিন্তা করার এবং এ বিষয়ে কাজ করার জন্য উদ্দীপনা পাবেন। প্রকাশনাটি বাজেট অলিম্পিয়াডের অংশ হিসেবে প্রকাশিত।

এই পুস্তিকায় বাজেটের বিভিন্ন দিক, বাজেট বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পুস্তিকাটি পাঠ করে একজন পাঠক সহজে জাতীয় বাজেট বুঝতে পারেন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং বাজেট নিয়ে কথা বলতে পারেন। পুস্তিকাটি তরুণদের বাজেট বিতার্কিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ. আর. আমান
সাধারণ সম্পাদক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়
বাজেট শিক্ষা

বাজেট কি

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন। বাজেট যে শুধু সরকারই তৈরি করে তা নয়; বাজেট ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী, দেশীয় বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো সংগঠনেরও হতে পারে। পরিবারের উপার্জন অনুযায়ী খরচ মেটানোর জন্য যেমন বাজেট তৈরি করা হয়, তেমনি দেশের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য সরকার বাজেট তৈরি করে থাকেন। দেশের বাজেট এক বছরের জন্য করা হয়ে থাকে।

জাতীয় বাজেট

'জাতীয় বাজেট' হলো, বাংলাদেশ সরকারের এক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবের দলিল। সাংবিধানিক পরিভাষায় এর নাম "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" বা "Annual Financial Statement"। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত দেশের বাৎসরিক হিসাব। এই বাজেট তৈরির সময়ে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়: (ক) সরকারে নীতি ও উদ্দেশ্য (যেমন: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, দারিদ্র্য নিরসন, কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় পরিকল্পনা; (খ) উক্ত নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব (যেমন, কর ও করবহির্ভূত আয়, অনুদান ইত্যাদি) সংগ্রহের পরিকল্পনা; (গ) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ব্যয় প্রাক্কলন বেশি অর্থাৎ ঘাটতি হলে তা মেটানোর পরিকল্পনা।

দেশের বাজেট সরাসরি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে ভূমিকা রাখে:

- সমাজে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বিত্তবান, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল, পেশাজীবিসহ যারা যত বেশি ক্ষমতাধর, জাতীয় বাজেট থেকে তারা তত বেশি সুবিধা আদায় করে নেয়;
- অপরদিকে কৃষক-শ্রমিকসহ নিম্নআয়ের অসংগঠিত মানুষ সব-সরকারের বাজেটেই কর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপের মধ্যে পড়েন। বাংলাদেশের বাজেট তাই প্রতিবছর মেহনতি, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবনে আতঙ্ক নিয়ে আসে;

- সরকারের বাৎসরিক বাজেটের মধ্যদিয়ে একটি দেশের এক বছরের সম্ভাব্য আয়, ব্যয় ও বিভিন্ন পরিকল্পনার চিত্র ফুটে ওঠে এবং ফুটে ওঠে সেই দেশের চলমান অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে থাকেন। সংসদে উপস্থাপিত বাজেটের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে যে ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন তা সংশোধনের পর জাতীয় বাজেট সংসদের অনুমোদন লাভ করে।

বাজেট একটি রাজনৈতিক দলিল...

- জাতীয় বাজেট আপাতঃদৃষ্টিতে একটি অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাপত্র মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে এটি একটি রাজনৈতিক দলিল।
- যেকোন সরকার তার রাজনৈতিক ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে জাতীয় বাজেটের আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ বাজেটে সরকারি দলের 'রাজনৈতিক আদর্শ ও অর্থনৈতিক চিন্তা' প্রতিফলিত হয়। যেমন: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কল-কারখানার উন্নতির জন্য বাজেটে সরকারি বরাদ্দ মিলবে কিনা, তা নির্ভর করে সে সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কলকারখানা চালাতে চায় কিনা সেই সিদ্ধান্তের ওপর। তেমনি সার-ডিজেল ইত্যাদির ওপর ভর্তুকি বাড়বে না কমবে তাও ঐ সরকারের 'সমাজতান্ত্রিক' বা 'পুঁজিবাদী' বা 'আধা-সমাজতান্ত্রিক' ও 'আধা-পুঁজিবাদী' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- গত দুই দশকে এদেশে খুব সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক দর্শনের প্রকাশ না দেখা গেলেও, প্রতিটি সরকারই কমবেশি 'খোলাবাজার নীতি' প্রয়োগ করে আসছে, যেখানে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও দেশজ সম্পদ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প-বাণিজ্য-সেবাখাত প্রসারের বদলে ব্যক্তিমালিকানায় তা প্রসারের জন্য বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে সরকার। এমনকি শিক্ষা-চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, খাবার পানি, বাসস্থানের মতো অতি মৌলিক প্রয়োজন বা অধিকারগুলোকে বাজারের পণ্য হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর বাজারের পণ্য কেউ বিনে পয়সায় বা জনসেবা করার জন্য

যে বিক্রি করে না তা একটা শিশুও বোঝে।

- উদাহরণ স্বরূপ, ব্যক্তিমালিকানায় খাবার পানি বিক্রির সরকারি নীতির কারণে এখন কমবেশি সারাদেশের মানুষকেই তুলনামূলকভাবে বেশি পয়সা দিয়ে পানি কিনে পান করতে হচ্ছে। অথচ সংবিধান মতে, সকল নাগরিকের জন্য সুলভে নিরাপদ খাবার পানির উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ব্যক্তির বাজেট বনাম সরকারের বাজেট

ব্যক্তির বাজেট	সরকারের বাজেট
ব্যক্তি আয় বুঝে ব্যয় করেন	সরকার খরচ বুঝে আয় করে
ব্যক্তির বাজেট দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হতে পারে	সরকারের বাজেট সবসময় এক বছরের জন্য করা হয়
কোন ব্যক্তির আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তিনি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, এনজিও কিংবা ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ করেন	সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে সরকার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অন্য কোন দেশ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধার করেন
ব্যক্তি বেশি ঋণ করে শোধ দিতে না পারলে আদালত তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে	সরকার কখনও দেউলিয়া হয় না
ব্যক্তির আয়ের উৎস চাকুরির বেতন, ব্যবসার মুনাফা ইত্যাদি	সরকারের আয়ের উৎস জনগণ থেকে প্রাপ্ত ট্যাক্স, ভ্যাট ও অন্যান্য আয়। সরকারের উদ্দেশ্য জনগণের সেবা করা, মুনাফা নয়
ব্যক্তির ব্যয়ের খাতগুলো- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চাহিদা মেটানোর খরচ	সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো- প্রশাসন চালানোর খরচ, জনগণকে সেবা প্রদানের খরচ এবং দেশের উন্নয়ন খরচ

বাজেটের উদ্দেশ্য

বাজেট কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের প্রধাণত ৩টি উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। যথা–

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার হাতিয়ার;

২. ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার; ও

৩. ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কৌশলের হাতিয়ার হিসেবে।

একটি দেশের বাজেট সে দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনে তথা অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে তা আমরা নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে বুঝতে পারবো:

- উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি (রাস্তা মেরামত–মাটিকাটা, কাবিখা, কাবিটা, উপবৃত্তি) কী দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করবে?
- সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কী কী কর্মসূচি নেয়া হয়েছে?
- বাজেট কী ধনী–গরীবের মধ্যকার এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমাবে?
- প্রত্যক্ষ করকে কী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে? কর ব্যবস্থা কী প্রগতিশীল?
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান কি উন্নত হবে?
- বাজেট প্রণয়নের পূর্বে কী উদ্দিষ্ট জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে?

বাজেটের সময়সীমা

জাতীয় বাজেটের সময়সীমা ১২ মাস বা এক বছর হয়ে থাকে, যাকে অর্থবছর বলা হয়। "বাৎসরিক আর্থিক হিসাব রাখার সময়কেই অর্থবছর বলা হয়।" বাজেটের এই সময়কালকে Fiscal Year বা রাজস্ববর্ষও বলা হয়। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন- ৫ বছর (পঞ্চবার্ষিকী) বা বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বার্ষিক বাজেট প্রণীত হয়। অর্থবছরের ভিত্তিতে সরকার আয়–ব্যয়ের পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে। প্রচলিত 'ক্যালেন্ডার বছর' এর সাথে 'অর্থবছর' এর কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন মাস থেকে

অর্থবছর শুরু হতে পারে। দেশভেদে অর্থবছরের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- বাংলাদেশে অর্থবছর শুরু হয় জুলাই মাসে, শেষ হয় জুন মাসে। আবার ভারতে শুরু হয় এপ্রিল মাসে, শেষ হয় মার্চ মাসে।

জাতীয় বাজেটের রূপরেখা

জাতীয় বাজেটের চারটি অংশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. প্রাপ্তি
২. ব্যয়
৩. বাজেট ঘাটতি
৪. ঘাটতি অর্থায়ন

১. প্রাপ্তি

কোন কোন উৎস থেকে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে?

সাধারণ মানুষ তথা নাগরিকের নির্ধারিত আয়ের ওপর কর, জমির খাজনা, ঘর-বাড়ির ওপর প্রযোজ্য কর; বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়মূল্যের ওপর বিক্রয়কর বা ভ্যাট; হাট-বাজার-সেতু ইজারার টোল; পণ্য আমদানি-রপ্তানি বাবদ শুল্ক বা ট্যারিফ; বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, দলিলের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প ইত্যাদির বিক্রয়মূল্য/মুনাফা; বিভিন্ন ধনী দেশ, আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা থেকে ঋণ ও অর্থ সাহায্য এবং দেশি-বিদেশি ব্যাংক ঋণ; জাতীয় সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি বন্ডের আমানত।

সরকার যে সব উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে তা দু'ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো, কর বাবদ প্রাপ্তি এবং কর ব্যতীত প্রাপ্তি।

ক. কর বাবদ প্রাপ্তি

এ ধরনের প্রাপ্তি মূলত: প্রত্যক্ষ কর। যেমন: ব্যক্তির আয়ের ওপর ট্যাক্স (আয়কর), ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর কর (কর্পোরেট আয়কর), দান কর, উত্তরাধিকার কর, ঘরবাড়ি-জমিজমা থাকলে তার ওপর কর ও খাজনা ইত্যাদি। পণ্য, সেবা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর আরোপিত কর থেকে আসে। পরোক্ষ কর থেকেও সরকার আয় করে থাকে।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক (মাদক জাতীয় দ্রব্যের ওপর কর), ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর বা বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি সরকারি হিসেবে আমাদের দেশে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কর আসে পরোক্ষ করের (ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি) মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের কাছ থেকে।

খ. কর ব্যতীত প্রাপ্তি
কর ব্যতীত প্রাপ্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশাসনিক ফি, লভ্যাংশ ও মুনাফা, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, সুদ, ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভি ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে রেলপথ, ডাক বিভাগ ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়।

২. ব্যয়
সরকারের প্রাপ্ত অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হয়?
সরকারি অর্থ সম্পদ মূলত দুটি বৃহত্তর খাতে ব্যয়িত হয়। এগুলো হলো, রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়।

ক. রাজস্ব ব্যয়
সরকার জনসাধারণকে যেসব সেবা দিয়ে থাকে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবহৃত অর্থই রাজস্ব ব্যয়। এ ব্যয় নৈমিত্তিক ধরনের হয়ে থাকে। শিক্ষক, পুলিশ, চৌকিদার, সামরিক বাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-বোনাস, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতিদের সম্মানী-বাসস্থান, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সম্মানীর বাজেট। সরকারি দপ্তরসমূহ বছরব্যাপী চালানোর খরচ, মেরামত, পরিবহন ব্যয়, মিটিং ইত্যাদির ব্যয় বাবদ বাজেট। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয়, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ব্যাংক, দাতা সংস্থার ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধ ইত্যাদিও রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য আমাদের আয়কর, ভ্যাট, শুল্ক ইত্যাদির সিংহভাগ উপরোক্ত খরচ মেটাতে ব্যয় হয়। অর্থাৎ জনগণের করের টাকাতেই সরকার চলে।

খ. উন্নয়ন ব্যয়

১৭টি বিষয়ভিত্তিক (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়নিষ্কাষণ, যোগাযোগ ইত্যাদি) খাতের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (যেমন– সড়ক, সেতু, রেল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) মানবসম্পদ উন্নয়ন (যেমন–শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) এবং কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দকৃত অর্থ উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নির্দিষ্ট একটি অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টরে প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন ব্যয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মূলত তিনটি উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করা হয়। এগুলো হচ্ছে– রাজস্ব উদ্বৃত্ত, ঋণ ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ।

স্থানীয় সরকারের জন্য (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা) উন্নয়ন সহায়তা বা থোক বরাদ্দ। থোক বরাদ্দের অর্থ স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে ব্যয় করা হয়।

৩. বাজেট ঘাটতি

সরকারের ব্যয় প্রাপ্তির চেয়ে বেশি হলে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। বাজেট ঘাটতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, উন্নয়ন কাজে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বড় আকারের বাজেট করা ইত্যাদি। যে বাজেটে খরচ বেশি আয় কম সেটি ঘাটতি বাজেট। অতীতে ঘাটতি বাজেটকে মনে করা হতো সরকারের দুর্বলতা, ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা। সমসাময়িককালের অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেট কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪. ঘাটতি অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তা হচ্ছে ঘাটতি অর্থায়ন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে অর্থাৎ ঘাটতি হলে ঋণ গ্রহণ করতে হয়, সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। তবে সরকার কতটুকু ঋণ নেবে তার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। তা না হলে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

সরকার মূলত দুটি উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন করে থাকে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ এবং অন্যটি বৈদেশিক।

- অভ্যন্তরীণ ঋণ আবার ব্যাংক এবং ব্যাংকবহির্ভূত- দু'অংশে বিভক্ত। ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ মূলত নেয়া হয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিম, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সমজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে।
- বৈদেশিক ঋণ থেকে অর্থের সংস্থান প্রকল্প সাহায্য (যেমন, বাজেট সহায়তা, অনুদান ও ঋণ আকারে সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচি সহায়তা) ইত্যাদি থেকে আসে।

বাংলাদেশের বাজেট কাঠামো

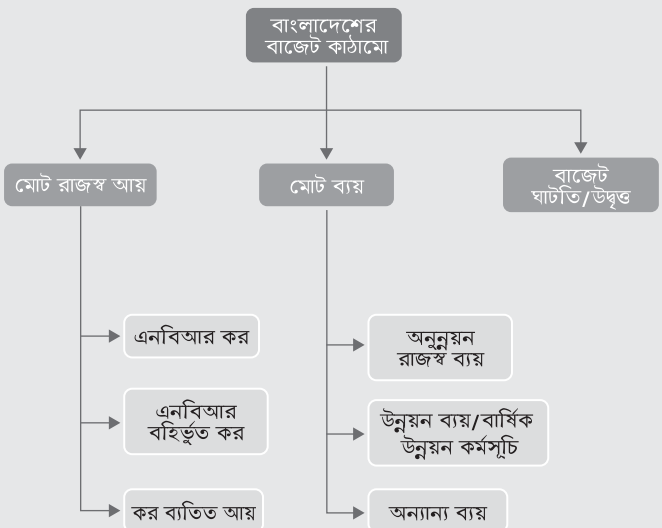

বাজেট কে তৈরি করেন?

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় বাজেট তৈরি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে সাধারণ শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ তো

দূরে থাক, সংসদসদস্যসহ স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কোন আইনী বা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া একটি প্রশাসনিক ও অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ঢাকায় বসে সরকারি কর্মকর্তা এবং কয়েকটি প্রভাবশালী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা দেশের বাজেট তৈরি করেন। 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়' সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে পরের বছরের খরচের তালিকা জোগাড় করেন। এরপর তারা 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে' অনুমোদনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেন এবং প্রকল্প অনুযায়ী কত টাকা আছে তার তালিকাও তৈরি করেন। এই তালিকা থেকে কোন্ প্রকল্পটা থাকবে আর কোন্টা বাদ যাবে তা ঠিক করে 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি', যা সংসদসদস্যগণ দ্বারা গঠিত। এক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়ের 'স্ট্যান্ডিং কমিটি'র কোন হাত থাকে না।

সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদে বাজেট পেশ করা হয় এবং শেষ সপ্তাহে তা পাশ করা হয়। বাজেট কার্যকর শুরু হয় ১ জুলাই মাস থেকে। মাননীয় মন্ত্রী-এমপিদের 'হ্যাঁ' ভোটের মাধ্যমে বাজেট পাশ হয়।

বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া সাংগঠনিক পদক্ষেপ ও বাজেট ক্যালেন্ডার-

জাতীয় বাজেট নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রক্রিয়ায় সরকারের বা রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বিভাগ জড়িত থাকে।

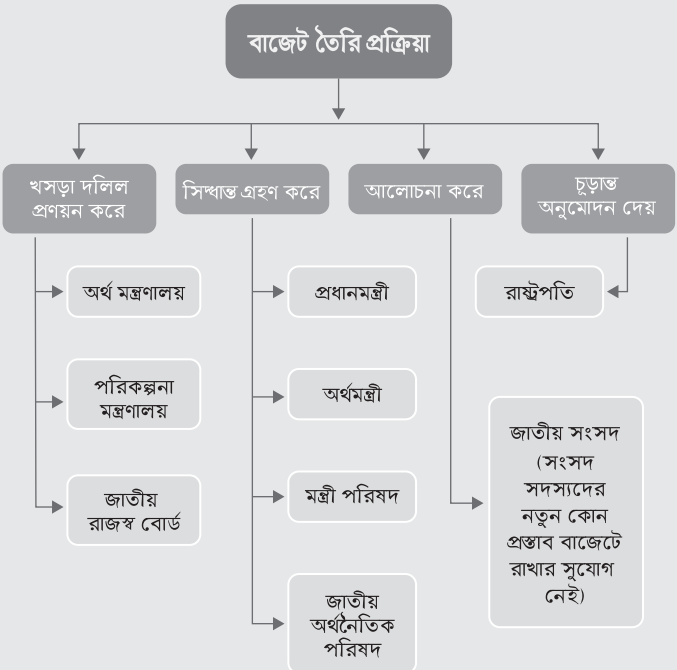

বাজেট চূড়ান্তকরণের ধাপসমূহ

বাজেট তিনটি ধাপে তৈরি করা হয় ।

১. প্রস্তাবিত বা খসড়া বাজেট
২. সম্পূরক বাজেট
৩. সংশোধিত বাজেট

প্রস্তাবিত বা খসড়া বাজেট

সারাবছর ধরে প্রস্তুত হওয়া বাজেট মন্ত্রী পরিষদে পাশ হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী অর্থবছরের শেষ (জুন) মাসের শুরুর দিকে জাতীয় সংসদে যে বাজেট উপস্থাপন করেন তাকে প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট বলে। প্রায় এক মাস ধরে সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের পর ছোটখাট কিছু সংশোধনী সমেত (যদি থাকে) বাজেট পাশ হয়। এই বাজেটই পরবর্তী বছরের জন্য কার্যকর হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাধারণত জুন মাসের ৭ তারিখ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। গণমাধ্যম (রেডিও-টেলিভিশনে) অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা সরাসরি প্রচার করে থাকে।

সম্পূরক বাজেট

বাৎসরিক বাজেটে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা বাজেট থাকে। অনেক সময় মন্ত্রণালয় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের চাইতে বেশি টাকা ব্যয় করে ফেলে তখন অতিরিক্ত খরচের জন্য একটি বাজেট দেয়া হয়, এটাকেই সম্পূরক বাজেট বলে।

সংশোধিত বাজেট

অর্থমন্ত্রী নতুন বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংসদে উপস্থাপনের সময় চলতি অর্থবছরের একটি সংশোধিত বাজেট সংসদে উপস্থাপন করেন। বিগত অর্থবছরে যে প্রস্তাবিত বাজেটটি পাশ হয় চলতি অর্থবছরে তার আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক সময় অর্জিত হয় না, আবার অনেক সময় লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া বাজেট যেহেতু জুন মাসে উপস্থাপন হয় সে কারণে জুন মাসের হিসাব হাতে থাকে না। ফলে বিগত ১১ মাসের (জুলাই থেকে মে) হিসাব বিশ্লেষণ করে জুন মাসের জন্য একটি আনুমানিক আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই সকল হিসাব একত্রিত করে চলতি বছরের একটি সংশোধিত বাজেট তৈরি করা হয় এবং তা সংসদে পাশ করিয়ে নেয়া হয়। এটাই সংশোধিত বাজেট।

বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা

বাজেট অনুমোদন ছাড়া সংসদ সদস্যদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। সংসদ

সদস্যরা বাজেট প্রস্তাবনায় 'হাঁ' অথবা 'না' বলতে পারেন বটে। কিন্তু তারা বাজেট সংশোধন বা বাজেটে নতুন কোন প্রস্তাব করতে পারেন না। ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা তাদের দল কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে না ভোট প্রয়োগ করলে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। বাজেট বিষয়ে সংসদের প্রধান কাজ হল নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটকে বিচার বিবেচনাহীণভাবে (Rubber Stamp) অনুমোদন দেওয়া। উল্লেখ্য, বাজেটে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ নিয়ে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কোন আলোচনা করা যায় না। বস্তুতঃ বাজেটের অবয়ব ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের একক কর্তৃত্ব অর্থমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে।

বাজেট বাস্তবায়ন

ক. বাজেট মঞ্জুরি অবহিতকরণ ও বণ্টন

সংসদে বাজেট অনুমোদনের পর অনুমোদিত বাজেট জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়। তারপর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ সম্পর্কে অবহিত করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন অপারেটিং ইউনিটসমূহের জন্য প্রযোজ্য মঞ্জুরি একজন আয়নব্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

খ. অর্থছাড়/অবমুক্তি

নগদ ব্যবস্থাপনার (Cash Management) স্বার্থে বাজেট মঞ্জুরির সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থছাড়/অবমুক্ত করা হয়। সাধারণত বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রথম তিন কিস্তির অর্থ অবমুক্তির এখতিয়ার রাখে। চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ব্যয় অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখা। একই সাথে, বরাদ্দকৃত অর্থ জনস্বার্থে ও যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয় সে উদ্দেশ্যে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ঘ. পুনঃউপযোজন
সাধারণত পূর্বনির্ধারিত কতিপয় নিয়মাবলি মেনে বাজেটে বরাদ্দকৃত এক খাতের অর্থ যৌক্তিক কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্য খাতে স্থানান্তরকে পুনঃউপযোজন বলা হয়। পুনঃউপযোজন করতে হলে নির্ধারিত নিয়মানুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়।

ঙ. অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ
ব্যয় স্থগিতকরণ, মিতব্যয়িতার ফলে ব্যয় সাশ্রয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত প্রাক্কলন কিংবা প্রশাসনিক কারণে স্বাভাবিক ব্যয়ের সাশ্রয় হলে অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করতে হয়। ভবিষ্যতের কেনো ব্যয় মেটানোর জন্য অব্যয়িত অর্থ ধরে রাখা যায় না। অব্যয়িত অর্থ অর্থবছরের শেষ দিনের (৩০ জুন) মধ্যে নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করতে হয়।

সরকারের বিভিন্ন স্তরের বাজেট

বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা থাকলেও নিম্নবর্ণিত দুই স্তরে বাজেট তৈরি হয়:

- কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বা জাতীয় বাজেট;
- স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বাজেট।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোগুলোতে যে বাজেট করা হয় তা সরকারি বাজেটেরই অংশ। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব সম্পদ আয়-ব্যয়েরভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের সাথে একই সময়ে স্থানীয় সরকারের বাজেট প্রণয়ন হয় না। যেমন- আইনানুযায়ী, সিটি কর্পোরেশনগুলোকে প্রতিবছর ১ জুনের আগেই বাজেট সম্পন্ন করতে হবে। আবার ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার

আইনে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে।

সংবিধান ও আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বাজেট প্রণয়ন করলেও, বর্তমানে জাতীয় বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ স্থানীয় পর্যায়ে ব্যয় হয়। এই অনুপাত অন্তত ১০ থেকে ১৫ গুণ বৃদ্ধি করা দরকার।

বাংলাদেশে বাজেট প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রীয় সরকার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। প্রণীত বাজেটে স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। স্থানীয় সরকারের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয় ততটুকু নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরাদ্দ বাড়ানো কমানোর ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের কিছু করার থাকে না।

স্থানীয় সরকারগুলোও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারগুলো তাদের বাজেট প্রস্তুত ও বরাদ্দ করে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পেলে স্থানীয় সরকারগুলোর বাজেট নামেমাত্র হয় এবং কোন কাজই প্রায় করতে পারে না। কারণ স্থানীয় সরকারের হাতে তেমন কোন সম্পদ বা আয়ের খাত নেই। অথচ বাজেট প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন ধারা আরও কার্যকর ও গণতান্ত্রিক করার জন্য স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক পরিমাণে সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই।

বাজেটের স্তরসমূহ

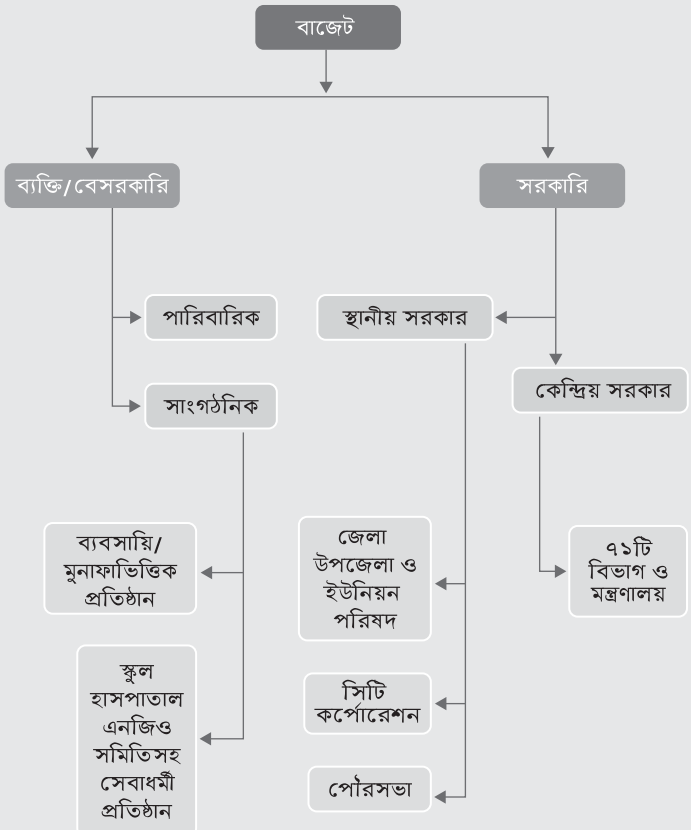
বাজেট
ব্যক্তি/বেসরকারি
সরকারি
পারিবারিক
সাংগঠনিক
স্থানীয় সরকার
কেন্দ্রিয় সরকার
ব্যবসায়ি/
মুনাফাভিত্তিক
প্রতিষ্ঠান
স্কুল
হাসপাতাল
এনজিও
সমিতিসহ
সেবাধর্মী
প্রতিষ্ঠান
জেলা
উপজেলা ও
ইউনিয়ন
পরিষদ
সিটি
কর্পোরেশন
পৌরসভা
৭১টি
বিভাগ ও
মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকারের বাজেট কেন 'সরকারি' বাজেট?

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ) সংবিধানর ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী স্থানীয় সরকার কাঠামো। বলা বাহুল্য, 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনাকারী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোই স্থানীয় সরকার'। এর অর্থ দেশের মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারের অংশ নয়, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার-চেয়ারম্যানও সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের অংশ। সে হিসেবে স্থানীয় সরকারের বাজেটও 'সরকারি বাজেট'। অর্থাৎ নাগরিক হিসাবে স্থানীয় সরকারের বাজেটে জনগণের ন্যায্য হিস্যা রয়েছে।
- জাতীয় সরকারের মতো স্থানীয় সরকারেরও নিজস্ব সম্পদ, অবকাঠামো, প্রশাসন, জনবল ও বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। আইন অনুযায়ী, তারা বার্ষিক বাজেটসহ, পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা করে।
- "আয় ব্যয় ও সম্পদের সকল উপাদান নিয়ে স্থানীয় সরকারের বাজেট তাই সরকারি বাজেট।"
- পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থের সংস্থান না থাকায় বর্তমান স্থানীয় সরকারের বাজেট কারো কাছেই তেমন গুরুত্ব পায় না। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ 'বসতবাড়ি কর' আদায় করে থাকে ।

আমরা বাজেট নিয়ে কথা বলবো, কেননা–

সরকারি অর্থের মালিক মূলত জনগণ। সুতরাং সুচারুভাবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ কীভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারেন, বাজেটে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা থাকে। বস্তুত বাজেট প্রতিটি নাগরিককে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করলেও অনেকেই তা অনুধাবন করতে পারেন না। বাজেটের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির জন্য এর মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন নাগরিকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষত, সাধারণ অর্থে বাজেট কী, জাতীয় বাজেট কী, এর রূপরেখা কী, কোথা থেকে অর্থ আসে, কোথায় তা ব্যয় করা হয়, কেন ঘাটতি হয়, কীভাবে তা মেটানো হয়–এসব বিষয়ে সবারই ধারণা থাকা দরকার।

আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক, আমরা কর প্রদান করি এবং সেই করের টাকা দিয়ে সরকার চলে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'My money my responsibility'। আমার টাকার দায়দায়িত্ব, তা সুচারুভাবে খরচ হচ্ছে কীনা, সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে কীনা তা দেখাও নাগরিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আমাদের আয়-উপার্জনের পথ সুলভ হবে কি না, ধনী-গরীব একই হারে ট্যাক্স দেবে কি'না, বাজারে চাল-তেলের মূল্য বাড়বে কি'না, বাচ্চার শিক্ষার খরচ সরকার দেবে কি'না, কৃষিতে সরকার কত ভর্তুকি দেবে, জীবন-জীবিকা ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকার আগামীতে কি পরিকল্পনা নিচ্ছে- এসব জানতে হলে আমাদের সবারই বাংলাদেশের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।

সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের 'মালিক' এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। যেহেতু রাষ্ট্রের মালিক জনগণ, তাই সাধারণ মানুষ যত বেশি আগ্রহ নিয়ে বাজেট বোঝার চেষ্টা করবে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করবে, বাজেটে ততই তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটার সুযোগ থাকবে। একইসাথে রাষ্ট্রীয় বাজেট জনগণের বাজেটে বা 'জনবান্ধব বাজেটে' পরিণত হবে।

বাজেট প্রণয়নের পূর্বে যাতে সরকার বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে (উন্নয়ন প্রকল্প, করনীতি ইত্যাদি) জনগণের মতামত গ্রহণ করার মাধ্যমে বাজেট প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক করে তোলে, সে ব্যাপারে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে।

জাতীয় বাজেটে নাগরিকদের মাথাপিছু অবদান

বিভাগ	অর্থবছর ২০০৮–০৯
	রাজস্ব খাত
ঢাকা	৬২৯০
চট্টগ্রাম	৪১৪৩
রাজশাহী ও রংপুর	৪৮৩৮
খুলনা	৪২৭০
বরিশাল	৩৭১৬
সিলেট	৩১৪৯
গড় মাথাপিছু বরাদ্দ	৪৯০৯

নাগরিকরা কেন কর দেয়?

- কর প্রদান করার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে, তথা সরকারের কাছ থেকে যেসব সেবা পাওয়ার কথা তা নিশ্চিত করতে কর দেই।
- ট্যাক্সের টাকায় সরকার প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী চালায় এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে ও আমাদেরকে নানারকম সেবা প্রদান করে। রাষ্ট্রীয় এইসব সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে আমরা কর দেই।
- আধুনিক রাষ্ট্রে কোন স্থাবর সম্পত্তির ওপর আমরা নিজেদের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের) অধিকার বজায় রাখার জন্য সরকারকে কর ও খাজনা দেই।

ভ্যাট কি? আমরা কেন ভ্যাট দিই?

- সরকার তার আয় বাড়ানোর জন্য সেবা, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ওপর 'বিক্রয় কর' আরোপ করে থাকে। আগে এটিকে টার্নওভার ট্যাক্স বলা হতো, যেখানে পণ্যের উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত মাত্র একবারই বিক্রয় কর পরিশোধ করতে হতো।

- ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে তৎকালীন সরকার এই পদ্ধতির পরিবর্তন করে পণ্যের উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত যতগুলো হাত বদল হয়ে বিক্রেতার কাছে পৌঁছায়, তার প্রতিটি স্তরে বিক্রয় কর ধার্য করে নতুন বিক্রয়কর পদ্ধতির প্রচলন করেন। একে 'ভ্যাট' (VAT) বা ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স অর্থাৎ 'মূল্য সংযোজন কর' বলা হয়।
- ভ্যাট প্রচলন করার ফলে জিনিসপত্রের বিক্রয় মূল্য বেড়ে যায়, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু খেটে খাওয়া, নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্যাট সরকারের রাজস্ব আয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। সরকারের রাজস্ব আয়ের সর্বোচ্চ খাত এখন ভ্যাট।

ভ্যাট নির্ধারণ

মনে রাখতে হবে সেবা বা উৎপাদনের প্রত্যেক ধাপে নিট মূল্যের ওপর সরকারকে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। ধরা যাক, একটা শার্টের খুচরা মূল্য ১৪০.৪০ টাকা। তুলা হচ্ছে শার্ট তৈরির প্রাথমিক উপাদান। তুলা থেকে দোকানে শার্ট বিক্রি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে আলাদা আলাদাভাবে নিম্নলিখিত হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আমরা জানি উৎপাদনের ৫/৬টি স্তর পার হয়ে একটি শার্ট তৈরি হয়। তবে হিসাব করার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত তিনটি স্তরে ভ্যাটের হিসাব করা হলো:

- তুলো উৎপাদন
- কাপড় বুনন ও শার্ট তৈরি
- দোকানে বিক্রি

প্রতিটি স্তরে ভ্যাটের পরিমাণ

পণ্য	বিক্রেতা	ক্রেতা	ভ্যাট ব্যতিত বাজার মূল্য (টাকা)	ভ্যাটের হার (অনুমান নির্ভর)	ভ্যাট (টাকা)	ভ্যাটসহ বিক্রয় মূল্য (টাকা)
তুলা	তুলা চাষী	বস্ত্র ও পোশাক কারখানা	১০০	৪.৫%	৪.৫০	১০৪.৫০
শার্ট	বস্ত্র ও পোশাক কারখানা	শার্টের দোকান	১০৪.৫০+ লাভ ৫.৫০ =১১০.০০	৬.০%	৬.৬০	১১৬.৬০
শার্ট	দোকানদার	ক্রেতা	১১৬.৬০+ লাভ ১৩.৪০ = ১৩০.০০	৮.০%	১০.৪০	১৪০.৪০
					২১.৫০	

ক্রেতা পর্যায়ে দৃশ্যমান ভ্যাট

ক্রেতা পর্যায়ে সর্বসাকুল্যে প্রযোজ্য ভ্যাট

ক্রেতা পর্যায়ে সর্বস্তরের ভ্যাটসহ মোট মূল্য

নাগরিকরা কখন ট্যাক্স নিয়ে প্রশ্ন তোলেন?

সরকার উচ্চ হারে কর আরোপ করলে নাগরিকরা কর পরিশোধের ব্যাপারে অভিযোগ করে। এছাড়াও সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে, মন্ত্রী-এমপি ও আমলারা দুর্নীতি ও অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে বিলাসিতা করলে এবং জনগণ তার জানমালের নিরাপত্তা ও ঠিকমতো সেবা না পেলে নাগরিকরা তাদের প্রদেয় ট্যাক্স নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

কেন্দ্রীভূত ও অগণতান্ত্রিক বাজেটের কারণে সাধারণ মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

বাংলাদেশে সরকারের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কারণে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রতিটি বিষয়ে নানা আমলাতান্ত্রিক স্তর ঘুরতে হয়। এই ব্যবস্থায় কোন জবাবদিহিতার প্রয়োজন পড়ে না এবং প্রতিটি স্তরে ঘুষের বা হয়রানির সুযোগ থাকে। এমনকি গ্রামের একটা ইটের রাস্তা বানাতে হলেও রাজধানীতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। স্কুলের শিক্ষকের পেনশনের টাকা পেতে তাকে ঢাকায় ছুটতে হয়। রাজধানীতে বসে তৈরি করার কারণে জাতীয় বাজেটের মধ্যে স্থানীয় সমস্যার ধরণ অনুযায়ী প্রকল্প নেয়া সম্ভব হয় না। রাজধানীতে বসে গুটি কয়েক সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীর তৈরি করা বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দরিদ্র অঞ্চলের প্রতি বৈষম্য তৈরি করা হয়।

বাজেট কি প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত?

- জাতীয় বাজেট প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। এলাকার উন্নয়নে যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে নির্ধারণ করে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড থেকে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা উচিত, যা ঐ জেলার সমস্ত উপজেলা ও পৌরসভার বাজেট চাহিদা যোগ করে জেলা পর্যায়ে সমন্বয় হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের মারফত বাজেটের অর্থ যোগান দিতে পারে।
- পাশাপাশি জাতীয় বাজেট ও স্থানীয় বাজেটের খাতসমূহ আলাদা করতে হবে। বাজেটকে স্থানীয় পর্যায়ে ভাগ করে দেয়ার (বিকেন্দ্রীকরণ) জন্য সম্ভাব্য খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ ও আয়ের পথ তৈরি করতে হবে। এ খাতগুলো হতে পারে– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- যে এলাকাগুলো উন্নত নয় সে এলাকার প্রতি বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি বাজেট দলিলকে সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেরকম করে উপস্থাপন করা।
- জনগণ যাতে সহজেই বার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারি কর্মসূচি ও বাজেট সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য উন্মুক্ত স্থান ও সরকারি দপ্তরে তথ্যবোর্ড স্থাপন, ওয়েবসাইটে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

কর বাহাদুর পরিবার

দীর্ঘ সময় ধরে কোন পরিবারের সকল সদস্য কর দিলে সে পরিবারকে 'কর বাহাদুর পরিবার' বলা হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে করদাতাদের উৎসাহিত করতে অর্থমন্ত্রী 'কর বাহাদুর পরিবার' ঘোষণার প্রস্তাব দেন।

বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সংবিধান ও আইন অনুযায়ী, জেন্ডার বৈষম্য ও অসমতা দূরীকরণ রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য অংশ হিসেবে গণ্য। দারিদ্র্য নিরসন ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি তথা জাতীয় বাজেট নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে কতটুকু কাজে আসে তা কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেখাই জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটে খাতওয়ারী আলাদা বরাদ্দ থাকে এমন নয়, বরাদ্দকৃত বাজেট জেন্ডার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের ফলে তাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা। এছাড়া, জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া নারী অধিকার আদায়ে সচেতনতা বাড়ানো, নীতি সংস্কার এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিবীক্ষণেও সহায়ক হয়। কিন্তু, প্রচলিত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। ফলে বাজেট নারী সমাজের উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী সমাজ কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না।

- RCGP (Recurrent, Capital, Gender and Poverty) Model -এর মাধ্যমে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দকে আলাদাভাবে দেখানো হয়। এমটিবিএফ (মিডটার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক) পদ্ধতির আওতায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বা নারীবান্ধব বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমটিবিএফের আওতায় বাজেট প্রাক্কলনের কৌশলগত পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ নারী উন্নয়নে কি ধরণের প্রভাব রাখবে তা তুলে ধরা হয়।
- ২০১০ সালে মাত্র ৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে শুরু হলেও ২০১২ সালে ২৫টি মন্ত্রণালয় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোসহ নারীবান্ধব বাজেট এর ওপর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

কৃষি ও কৃষকবান্ধব বাজেট

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর– এই কথা বর্তমানে জোর দিয়ে বলা না গেলেও কৃষি এখনও এ দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত। এ খাতের সম্ভাবনাও সুদূরপ্রসারী। ফলে জাতীয় বাজেটে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। বাজেটে কৃষির উন্নতি–অবনতি এবং কৃষকের চাওয়া–পাওয়া ও প্রত্যাশার প্রতিফলন কতটুকু ঘটছে কৃষি বাজেটে তাই তুলে ধরা হয়। কৃষির উপখাত বনজ, মৎস ও প্রাণীসম্পদ কৃষি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গত তিন বছর ধরে পল্লী উন্নয়নকে কৃষির সাথে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা হয়। কৃষি বাজেটে কৃষকের সার–বীজ–কীটনাশক–উপকরণের মূল্য ও সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য, কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকে।

জিডিপিতে প্রতিবছরই কৃষিখাতের অবদান একটু একটু করে কমছে। বর্তমানে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৫.৫৯ শতাংশ কিন্তু এ খাতে নিয়োজিত আছে ৪৫ শতাংশ শ্রমশক্তি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ। তাই কৃষিকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রাণ। কৃষক বাঁচলে দেশ বাচবে। কৃষির উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে। জিডিপিতে প্রতি বছর কৃষির অবদান কমলেও প্রতি বছর বাড়ছে কৃষির প্রবৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদন। গত তিন বছর ধরে কৃষিতে প্রতি বছর গড়ে ৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। কৃষি শস্য উৎপাদনে এই প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় কৃষি বাজেট বাড়ছে না।

জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে বাজেট: জলবায়ু তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP-2009 ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব তহবিলে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২০০৮–০৯ থেকে ২০১৪–১৫ অর্থবছরে সর্বমোট ২,৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিগত জুন ২০১৬ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় বিসিসিএসএপি–২০০৯–এর ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৩২০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত খাদ্য, সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ খাতে

গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ', 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উষ্ণতা এবং লবণসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত বাছাই' অন্যতম।

এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন করা হয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত এ ফান্ডে মোট ১৩০.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

চলমান ব্যবস্থায় সমাজের যে অংশের মানুষ নিজেরা নিজেদের জীবনধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না তাদের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এটি সরকার ঘোষিত কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করা জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য সীমার নিচ থেকে তুলে আনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে তাদেরকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

স্বাধীনতার পর থেকে সরকার অনেকগুলো (প্রায় ৭ ডজন) সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া দেশী-বিদেশি দাতা সংস্থাও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করছে। কিন্তু তাতেও দারিদ্র্যের হার কাঙ্ক্ষিত স্তরে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০%, ২০১০ সালে তা কমে হয়েছে ৩১.৫%।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-

- বিভিন্ন প্রকার ভাতা- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, গার্মেন্টসে কর্মরত দরিদ্র মায়েদের ল্যাকটেটিন ভাতা, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ভিজিডি ও ভিজিএফ এবং অনগ্রসর দলিত, হরিজন, বেদে ও হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ভাতা।
- এতিম শিশু কল্যাণ- সরকারি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ও বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের জন্য খোরাকি ভাতা।

- অন্যান্য কর্মসূচি–প্রতিবন্ধী জরিপ, অটিজম, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, ভিক্ষুক পূণর্বাসন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্রঋণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের যে কর্মসূচি তাই মানবসম্পদ কর্মসূচি। আমাদের দেশের বাজেট কাঠামোতে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সংস্কৃতি, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া। তবে বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয় এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়। শুধু শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ বরাদ্দ দরকার প্রকৃত বরাদ্দ তার তুলনায় অনেক কম। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ নিম্ন মানব সূচক উন্নয়নের তালিকাভুক্ত দেশ। ১৮৭ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন বিশেষ এলাকাকে বিশেষ কোন অর্থনেতিক কর্মকান্ডের জন্য গড়ে তোলা হলে ঐরূপ অঞ্চলকে অর্থনৈতিক অঞ্চল বলা চলে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। এরূপ অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছে।

২০১৫–১৬ অর্থবছরে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিভিন্ন এলাকায় বিভাজন করা হয়েছে।

- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone): এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য নির্ধারিত।

- অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Domestic Processing Area): দেশীয় বাজার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্য নির্ধারিত।
- বাণিজ্যিক এলাকা (Commercial Area): ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ওয়্যার হাউজ, অফিস বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত।
- প্রক্রিয়াকরণমুক্ত এলাকা (Non Processing Area): আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত।

জেলা বাজেট

জাতীয় বাজেটে সরকারের যে ব্যয় পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটে তা মূলত মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক। এক্ষেত্রে ভূ-অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রদর্শিত হয় না। তবে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের স্বার্থে সরকার জেলা বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। বিভিন্ন জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদর্শন করে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের সাথে পাইলটভিত্তিতে টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল সরকারি দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেট থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করে জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় প্রকার বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকার ছয়টি বিভাগীয় জেলা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট জেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার বাজেট ঘোষণা করে। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে আর কোন জেলা বাজেট ঘোষণা করা হয়নি।

সরকারের জনসেবা

সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের (প্রশাসন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার ইত্যাদি) মাধ্যমে সরকার জনগণের জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য যে সকল সেবা প্রদান করে তাই জনসেবা বা পাবলিক সার্ভিসখাত। আমাদের দেশে সরকারের জনসেবার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। প্রশাসনে

প্রশাসনে প্রতিটি স্তরে রয়েছে ঘুষ-দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি। এটা এখন ওপেন সিক্রেট ব্যাপার যে, টোকেন মানি বা ঘুষ ছাড়া সরকারি টেবিলের ফাইল নড়ে না। অতিরিক্ত অর্থ বা ঘুষ না দিয়ে সরকারি অফিসে প্রায় কোন কাজই করা যায় না। ২০১০ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত টিআইবির এক খানা জরিপে দেখা যায়, শতকার ৮৪ ভাগ বাংলাদেশি সরকারি সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার হন এবং প্রতিটি পরিবার এক বছরে গড়ে ঘুষ দিয়েছেন ৪,৮৩৪ টাকা। ঐ একই জরিপে দেখা যায়, বিচার, ভূমি বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ। এছাড়া সরকারি প্রতিটি বিভাগেই সেবা গ্রহণ করার জন্য ঘুষ দিতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মান নিশ্চিত না হলে সরকারি সম্পদের অপচয় হয়। জনসেবার মান নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে যেমন প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি সেবা গ্রহণকারী বা জনগণকেও সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

রাষ্ট্রের পাঁচ বছর মেয়াদি যে উন্নয়ন দলিল তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করে এটি তারমধ্যে অন্যতম। বর্তমানে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন আর বিগত পরিকল্পনার পিছিয়ে থাকা ক্ষেত্রগুলোর উত্তোরণের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৫ থেকে যাত্রা শুরু সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি ২০১৫-২০২০) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। পাশাপাশি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করতে ২০২১-২০৪০ পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য হল- 'প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিকের ক্ষমতায়ন'।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে মূলধন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী বাণিজ্য ও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি টেকসই, সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ুসহিষ্ণু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ে তোলা'।
- এই পরিকল্পনায় লক্ষ্যগুলো হচ্ছে- ১. জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীতকরণ; ২. দারিদ্র্য দূরীকরণ; ৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন; ৪. বিদ্যুৎ জ্বালানি নিশ্চিতকরণ; ৫. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ও ৬. বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতকরণ। এই লক্ষ্য পূরণে ৭টি বিষয়কে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- কারিগরি ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠন; বিভিন্ন অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ; কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের কৌশল নির্ধারণ; ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ; আইসিটি খাতের ব্যাপক প্রয়োগ-প্রসার ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের পাঁচ বছর ধরে গড়ে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ হারে মোট দেশজ আয় (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় পাঁচ বছরে ১ কোটি ২৯ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্যহার কমিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করা হয়। পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় রপ্তানি আয় ৩০ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালে ৫৪ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়।
- সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ২ দশমিক ০২ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে জিডিপির ২ দশমিক ৩০ ভাগে উন্নীত করা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৩১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে। মোট বিনিয়োগের ৭৭ দশমিক ৩ ভাগ আসবে বেসরকারি খাত থেকে। বাকি ২২ দশমিক ৭ ভাগ আসবে সরকারি খাত থেকে।

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালে ৫ দশমিক ৫ ভাগে কমিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ রাজস্ব ও জিডিপির অনুপাত বর্তমানের ১০ দশমিক ৮ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৬ দশমিক ১ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০–২১

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপরেখা বা রোডম্যাপ। বাংলাদেশ সরকার ১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০–২০২১ ঘোষণা করেছে। যা রূপকল্প–২০২১ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই দলিল পাশ হয় ২০১২ সালের ১০মে। এটি বাংলাদেশ সরকার প্রণীত প্রথম দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় তিনটি মৌলিক নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, আইনের শাসন নিশ্চিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, উন্নত সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি খাতকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো দক্ষ করে তোলা।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলার অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা, দেশে দারিদ্র্যের হার ২০২১ সালের মধ্যে ১৩ দশমিক ৫ শতাংশে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে এ হার ২২ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি প্রবৃদ্ধি) ২০১৫ সালে ৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে পরিকল্পনায়। ২০১২–১৩ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ শতাংশ। ২০১৫ সাল নাগাদ জিডিপি'র ৩২ দশমিক ১ শতাংশ সঞ্চয় ও ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ বিনিয়োগ এবং ২০২১ সালে তা যথাক্রমে ৩৯ দশমিক ১ ও ৩৮ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

পরিকল্পনায় ২০২১ সাল নাগাদ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ২ শতাংশে স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে।

বেকারত্বের হার ২০১৫ সালে ২০ শতাংশে এবং ২০২১ সালে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রস্তাবিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়।

এছাড়া ১০০ ভাগ প্রাইমারি শিক্ষা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, সবার জন্য বাসস্থান, ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নসহ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়কেই এই বিস্তৃত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১

এটি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন দর্শন। এতে দেশের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন সহ বিবিধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এর ভিত্তিতে বর্তমান সরকার ১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ঘোষণা করেছে।

রূপকল্প-২০৪১

এটি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন। ২০১৩ সালে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ এক উন্নত জনপদে পরিণত করা হবে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs)

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ২০০০ সালে জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত একটি উন্নয়ন কৌশল। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯টি দেশ এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। ১৯৯০ সালকে ভিত্তি ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে বৈশ্বিক দারিদ্র অর্ধেক কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এমডিজিস্ কৌশলে। এমডিজিস্ অঙ্গীকার পূরণে ৮টি লক্ষ্য ও লক্ষ্যপূরণ যাচাই করার জন্য কতগুলো লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক ঠিক করা হয়।

এমডিজিস্ এর ৮টি লক্ষ্য

১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল
২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা
৩. নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪. শিশুমৃত্যু হ্রাস
৫. মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৬. এইচআইভি এইডস্ ও অন্যান্য রোগের মোকাবেলা
৭. টেকসই পরিবেশ
৮. উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশ এমডিজির মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাসের মত বিষয়গুলোতে কিছু বিষয়ে সাফল্য লাভ করলেও দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই নগন্য। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাসের মত বিষয়গুলোয় বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দারিদ্র্য কমলেও ধন বৈষম্য বেড়েছে।

স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs)

অনেক আলোচনা- পর্যালোচনার পর ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহিত হয়। ২০৩০ সাল পর্যন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ বিষয়ক সকল বিষয়ের সমন্বিত রূপকল্প হিসেবে এসডিজি গৃহিত হয়; যার মাধ্যমে সকল মানুষের উন্নত জীবন ধারণের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার পাশাপাশি ধনী-দরিদ্র এবং সব দেশের জন্য করণীয় ঠিক করে দেয়া হয়েছে। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

লক্ষ্য-০১ : সকল পর্যায়ের সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান;

লক্ষ্য-০২ : ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নততর পুষ্টিমান অর্জন এবং স্থায়িত্বশীল কৃষি সম্প্রসারণ;

লক্ষ্য-০৩ : সকল বয়সী, সকল মানুষের সুস্থ্য জীবন ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ;

লক্ষ্য-০৪ : ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত সম-মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং

সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি;

লক্ষ্য-০৫ : নারী পুরুষের সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন;

লক্ষ্য-০৬ : সবার জন্য পানি ও পয়ঃব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

লক্ষ্য-০৭ : মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী-শক্তিতে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;

লক্ষ্য-০৮ : সবার জন্য সমন্বিত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি;

লক্ষ্য-০৯ : টেকসই অবকাঠামো বিনির্মাণ, সমন্বিত ও টেকসই শিল্পায়ন উন্নীতকরণ এবং নতুন উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ;

লক্ষ্য-১০ : আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশীয় অসমতা হ্রাস;

লক্ষ্য-১১ : শহর ও জনবসতিকে সমন্বিত উপায়ে নিরাপদ ও স্থায়িত্বশীল করা;

লক্ষ্য-১২ : দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

লক্ষ্য-১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;

লক্ষ্য-১৪ : স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য মহাসমুদ্র, সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার;

লক্ষ্য-১৫ : স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা, পুন:স্থাপন ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রতিরোধ এবং ভূমি ক্ষয়রোধ ও রহিতকরণ ও প্রাণ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা,

লক্ষ্য-১৬ : স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিনির্মাণ,

লক্ষ্য-১৭ : স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পুন:সক্রিয়করণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়া জোরদারকরণ।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) একটি উন্নয়ন মডেল। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই পিপিপি'র উদ্দেশ্য। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে সরকার পিপিপি মডেল উপস্থাপন করে। যা অর্জন করতে গেলে প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সরকারের একার পক্ষে এতো বিপুল বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। আবার বিদেশ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় সময় বিপুল সাহায্য বা ঋণ পাওয়া সম্ভব হয় না। সে কারণে এই মডেলের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়।

পিপিপিতে দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বার-উন্মোচনের জন্য ৩টি নতুন খাত সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে-

১. পিপিপি কারিগরি সহায়তা খাত;

২. ভর্তুকি খাত ও

৩. অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল (বাজেট বক্তৃতা ২০০৯-১০)। অবস্থানপত্রে পিপিপি উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পগুলোকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: জনগুরুত্বপূর্ণ অতি বিশাল প্রকল্প, জনগুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের প্রকল্প।

২০০৯-১০ বাজেটে পিপিপিতে প্রথম ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পরবর্তী প্রতিটি বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেট রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পিপিপি কোন সাফল্যজনক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

এক নজরে বাংলাদেশের বাজেট

অর্থবছর ১৯৭২–৭৩ থেকে অর্থবছর ২০১৭–১৮ পর্যন্ত

বাজেট নং	অর্থবছর	অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা	বাজেটের আকার (কোটি টাকায়)
১ম	১৯৭২–৭৩	তাজউদ্দিন আহমেদ	৭৮৬
২য়	১৯৭৩–৭৪	তাজউদ্দিন আহমেদ	৯৯৫
৩য়	১৯৭৪–৭৫	তাজউদ্দিন আহমেদ	১,০৮৪
৪র্থ	১৯৭৫–৭৬	ড. আজিজুর রহমান	১,৫৪৯.১৯
৫ম	১৯৭৬–৭৭	জিয়াউর রহমান	১,৯৮৯.৮৭
৬ষ্ট	১৯৭৭–৭৮	জিয়াউর রহমান	২,১৮৪
৭ম	১৯৭৮–৭৯	জিয়াউর রহমান	২,৪৯৯
৮ম	১৯৭৯–৮০	ড. এমএন হুদা	৩,৩১৭
৯ম	১৯৮০–৮১	এম সাইফুর রহমান	৪,১০৮
১০ম	১৯৮১–৮২	এম সাইফুর রহমান	৪,৬৭৭
১১শ	১৯৮২–৮৩	এমএ মুহিত	৪,৭৩৮
১২শ	১৯৮৩–৮৪	এমএ মুহিত	৫,৮৯৬
১৩শ	১৯৮৪–৮৫	এম সাইদুজ্জামান	৬,৬৯৯
১৪শ	১৯৮৫–৮৬	এম সাইদুজ্জামান	৭,১৩৮
১৫শ	১৯৮৬–৮৭	এম সাইদুজ্জামান	৮,৫০৪
১৬শ	১৯৮৭–৮৮	এম সাইদুজ্জামান	৯,৫২৭
১৭শ	১৯৮৮–৮৯	মে.জে. (অব:) এমএ মুনেম	১০,৫৬৫
১৮শ	১৯৮৯–৯০	ড. ওয়াহিদুল হক	১২,৭০৩
১৯শ	১৯৯০–৯১	মে.জে. (অব:) এমএ মুনেম	১২,৯৬০
২০শ	১৯৯১–৯২	এম সাইফুর রহমান	১৫,৫৮৪
২১শ	১৯৯২–৯৩	এম সাইফুর রহমান	১৭,৬০৭
২২শ	১৯৯৩–৯৪	এম সাইফুর রহমান	১৯,০৫০
২৩শ	১৯৯৪–৯৫	এম সাইফুর রহমান	২০,৯৪৮

২৪শ	১৯৯৫-৯৬	এম সাইফুর রহমান	২৩,১৭০
২৫শ	১৯৯৬-৯৭	ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অন্তবর্তীকালীন বাজেট
২৬শ	১৯৯৬-৯৭	শাহ এএমএস কিবরিয়া	২৪,৬০৩
২৭শ	১৯৯৭-৯৮	শাহ এএমএস কিবরিয়া	২৭,৭৮৬
২৮শ	১৯৯৮-৯৯	শাহ এএমএস কিবরিয়া	২৯,৫৩৭
২৯শ	১৯৯৯-২০০০	শাহ এএমএস কিবরিয়া	৩৪,২৯২
৩০ তম	২০০০-০১	শাহ এএমএস কিবরিয়া	৩৮,৫২৪
৩১ তম	২০০১-০২	শাহ এএমএস কিবরিয়া	৪২,৩০৬
৩২ তম	২০০২-০৩	এম সাইফুর রহমান	৪৪,৮৫৪
৩৩ তম	২০০৩-০৪	এম সাইফুর রহমান	৫১,৯৮০
৩৪ তম	২০০৪-০৫	এম সাইফুর রহমান	৫৭,২৪৮
৩৫ তম	২০০৫-০৬	এম সাইফুর রহমান	৬৪,৩৮৩
৩৬ তম	২০০৬-০৭	এম সাইফুর রহমান	৬৯,৭৪০
৩৭ তম	২০০৭-০৮	এবিএম মির্জা আজিজুল ইসলাম	৮৭,১৩৭
৩৮ তম	২০০৮-০৯	এবিএম মির্জা আজিজুল ইসলাম	৯৯,৯৬২
৩৯ তম	২০০৯-১০	আবুল মাল আবদুল মুহিত	১,১৩,৮১৯
৪০ তম	২০১০-১১	আবুল মাল আবদুল মুহিত	১,৩২,১৭০
৪১ তম	২০১১-১২	আবুল মাল আবদুল মুহিত	১,৬৩,৫৮৯
৪২ তম	২০১২-১৩	আবুল মাল আবদুল মুহিত	১,৯১,৭৩৮
৪৩ তম	২০১৩-১৪	আবুল মাল আবদুল মুহিত	২,২২,৪৯১
৪৪ তম	২০১৪-১৫	আবুল মাল আবদুল মুহিত	২,৫০,৫০৬
৪৫ তম	২০১৫-১৬	আবুল মাল আবদুল মুহিত	২,৯৫,১০০
৪৬ ৩ম	২০১৬-১৭	আবুল মাল আবদুল মুহিত	৩,৪০,৬০৫
৪৭ ৩ম	২০১৭-১৮	আবুল মাল আবদুল মুহিত	৪,০০,২৬৬
৪৮ ৩ম	২০১৮-১৯	আবুল মাল আবদুল মুহিত	৪,৬৪,৫৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাজেট পরিভাষা

অর্থবছর সরকারের হিসাব পরিগণনার সময়কে অর্থবছর বলা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থবছর শুরু হয় পহেলা জুলাই এবং শেষ হয় তিরিশে জুন তারিখে। অর্থবছরের ভিত্তিতে সরকার আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে। প্রচলিত 'ক্যালেন্ডার বছর'-এর সাথে 'অর্থবছর'-এর কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন মাস থেকে অর্থবছর শুরু হতে পারে। দেশভেদে অর্থবছরের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- বাংলাদেশে অর্থবছর শুরু হয় জুলাই মাসে, শেষ হয় জুন মাসে। আবার ভারতে শুরু হয় এপ্রিল মাসে, শেষ হয় মার্চ মাসে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থির মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। স্থির মূল্য হল কোন একটা নির্দিষ্ট বা ভিত্তি বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের মূল্য স্থির করা হয়। তার সাথে চলতি মূল্যের প্রতি বছরের পার্থক্যই বাৎসরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধারণত শতাংশে প্রকাশ করা হয়। খুব সহজে বললে, কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় পরবর্তী বছরে যত শতাংশ বাড়ে তাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। ধরা যাক, ২০১৬ সালে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় ছিল ১০০০ টাকা , ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১১০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি হাজারে ১০০ টাকা বাড়ায় শতকরা বেড়েছে ১০% । এই ১০% ই হলো 'ক' দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারের বাৎসরিক আর্থিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

অধোগতিশীল কর এটি এক ধরণের কর নির্ধারণ কৌশল। এই পদ্ধতিতে বেশি উপার্জনের জন্য দরিদ্ররা ধনীদের চেয়ে বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে। ইংরেজিতে এটাকে Regressive tax বলে। যে দেশে যত বেশি পরোক্ষ কর সে দেশে তত বেশি পশ্চাদগামী বা আরোগতিশীল ট্যাক্স। আমাদের দেশে

প্রগতিশীল কর পদ্ধতি চালু থাকলেও পরোক্ষ কর বেশি হবার কারণে সামগ্রিক ট্যাক্স পদ্ধতি আরোগতিশীল।

অব্যয়িত ও সমর্পণ বাজেটে বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত অর্থকে অব্যয়িত হিসেবে গণ্য করা হয়। বরাদ্দকৃত অব্যয়িত অর্থ ব্যয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করাকে সমর্পণ হিসেব গণ্য করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নির্দিষ্ট অর্থ বছরে প্রদানকৃত অর্থ উক্ত অর্থবছরে ব্যয় করা সম্ভব না হলে এই ধরণের ঘটনা ঘটে।

অনুদান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বা সরকারকে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ যার বিনিময়ে কিছু প্রদান করতে হয় না। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ পরিশোধ করতে হয় না।

অনুন্নয়ন বাজেট সরকার জনসাধারণকে যেসব সেবা দিয়ে থাকে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবহৃত অর্থই রাজস্ব ব্যয়। এ ব্যয় নৈমিত্তিক ধরনের হয়ে থাকে। শিক্ষক, পুলিশ, চৌকিদার, সামরিক বাহিনীসহ ১৩ লক্ষাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-বোনাস, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতিদের সম্মানী-বাসস্থান, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সম্মানীর বাজেট। সরকারি দপ্তরসমূহ বছরব্যাপী চালানোর খরচ, মেরামত, পরিবহন ব্যয়, মিটিং ইত্যাদির ব্যয় বাবদ বাজেট। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয়, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ব্যাংক, দাতা সংস্থার ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধ ইত্যাদিও রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য আমাদের আয়কর, ভ্যাট, শুল্ক ইত্যাদির সিংহভাগ উপরোক্ত খরচ মিটাতে ব্যয় হয়। অর্থাৎ জনগণের করের টাকাতেই সরকার চলে।

অসম বাজেট যে বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ নয় তাকে অসম বাজেট বলে। এই বাজেটে সরকারের আয় ব্যয় সমান হয় না। এখানে ব্যয় অপেক্ষা আয় কম বা বেশি হবে। অসম বাজেট ০২ ধরনের হয়ে থাকে : ১. উদ্বৃত্ত বাজেট ও ২. ঘাটতি বাজেট।

আবগারি শুল্ক দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়ের জন্যে উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর আরোপযোগ্য পরোক্ষ করকে আবগারি শুল্ক বলে। আবগারি শুল্ক তথাকথিত অনভিপ্রেত দ্রব্যাদি যেমন- মদ, তামাক ইত্যাদি ভোগকে নিরুৎসাহিত করতে আরোপ করা হয়। কখনো বা কোনো কোনো দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বা মুদ্রাস্ফীতির চাপে উক্ত দ্রব্য ব্যবহার/ভোগ নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাসের জন্য আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। আবগারি শুল্ককে কখনো-কখনো পাপকর বলে অভিহিত করা হয়।

আমদানি শুল্ক আমদানি কমানোর জন্য আমদানিকৃত পণ্যের ওপর যে শুল্ক বসানো হয় তাকে আমদানি শুল্ক বলা হয়। আবার অনেক সময় আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো হয়। যাতে দেশীয় বাজারে ঐসব পণ্যের দাম কম ও সহজলভ্য হয়। সাধারণত দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য আমদানি কমাতে হয়। কারণ বিদেশি প্রতিষ্ঠান সবসময় তাদের পণ্য দিয়ে আমাদের বাজার দখল করতে চায়। তাই এসব পণ্যের হাত থেকে দেশীয় বাজার ও পণ্যকে রক্ষা করার জন্য আমদানির ওপর অতিরিক্ত পরিমাণ শুল্ক বা কর আরোপ করা হয়।

আয়কর আয়কর হলো সরকার কর্তৃক তার অধিক্ষেত্রাধীন সকল সত্তার উদ্ভূত আয়ের ওপর আরোপিত একটি কর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট অর্থবছরে কোন একজন ব্যক্তির বার্ষিক আয় ২,৭৫,০০০ টাকা। যেখানে আয়কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা এবং করের হার ১০ শতাংশ। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির করযোগ্য আয় হলো ২৫,০০০ টাকা এবং ১০ শতাংশ হারে স্থূল করের পরিমাণ ২৫০০ টাকা।

আর্থিক নীতি কর, ব্যয় এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালাকে আর্থিক নীতি বলে অভিহিত করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প ভৌত পরিসম্পদ তৈরি বা উন্নয়ন কিংবা মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রণীত বাজেট। উন্নয়ন প্রকল্পের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা এবং অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট উৎস থাকে। বাংলাদেশে অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত হয়।

উন্নয়ন বাজেট ১৭টি বিষয়ভিত্তিক (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়নিষ্কাষণ, যোগাযোগ ইত্যাদি) খাতের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (যেমন– সড়ক, সেতু, রেল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) মানবসম্পদ উন্নয়ন (যেমন– শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) এবং কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দকৃত অর্থ উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নির্দিষ্ট একটি অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টরে প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন ব্যয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এছাড়া স্থানীয় সরকারের জন্য (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা) উন্নয়ন সহায়তা বা থোক বরাদ্দ। থোক বরাদ্দের অর্থ স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে ব্যয় করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মূলত তিনটি উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করা হয়। এগুলো হচ্ছে–রাজস্ব উদ্বৃত্ত, ঋণ ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ।

উদ্বৃত্ত বাজেট যে বাজেটে খরচ কম, আয় বেশি সেটাই উদ্বৃত্ত বাজেট। যে সব দেশে মোট রাজস্ব আয়ের তুলনায় রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় কম হয় তাদের পক্ষেই উদ্বৃত্ত বাজেট করা সম্ভব। ধরা যায়, কোন দেশের সরকার একটি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে সকল উৎস হতে আয়ের পরিমাণ ৫,৫০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সব মিলিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন

করেছে। সরকারের মোট আয় দিয়ে মোট ব্যয়ের চাহিদা মিটিয়ে আরও ৫০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ায় এ ধরণের বাজেটকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

ঋণ

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেট ঘাটতি হয়। ঘাটতি পূরণে সরকারকে প্রতিবছরই দুই ধরনের উৎস থেকে ঋণ নেয়। ১. আভ্যন্তরীণ উৎস- দেশের ভেতর বন্ড ও সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ও দেশের কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। ২. বৈদেশিক উৎস- দেশের বাইরে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

ঋণ পরিশোধ

ঋণ পরিশোধ' বলতে ঋণের আসল অর্থ পরিশোধ করাকে বুঝায়। ঋণ পরিশোধ সুদ পরিশোধ থেকে আলাদা, কেননা সুদ পরিশোধ ঋণকৃত অর্থ ব্যবহারের চার্জ হিসাবে গণ্য হয় এবং তা অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঋণ ও সুদ যে সময়ে পরিশোধ করা হয় ঠিক সে সময়েই সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত হয়, তবে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যে সময়ের জন্য তা পরিশোধযোগ্য সে সময়েই হিসাবভুক্ত হয়।

কর অনুপাত

কর অনুপাত বলতে একটি দেশের কর রাজস্ব ও জিডিপি'র অনুপাতকে বুঝায়। এটি কোন দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির কর সংক্রান্ত সূচক। ধরা যায়, কোন দেশের একটি অর্থবছরে কর আহরণের পরিমাণ ৩৫০০ কোটি টাকা এবং চলতি বাজার মূল্যে জিডিপির পরিমাণ ৩৫০০০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে জিডিপির শকতরা হারে কর রাজস্বের পরিমাণ ১০ শতাংশ।

কর অবকাশ/ ট্যাক্স হলিডে

কোন নির্দিষ্ট পণ্য, ব্যবসা বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য কর কমানো বা মওকুফ করা হয়। সরকার কোন খাতে সম্ভাবনা দেখলে সে খাতে কর

কমিয়ে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে, যাতে ব্যবসায়ীরা কর অবকাশ সুবিধা নিয়ে বেশি মুনাফা করার জন্য বিনিয়োগ করে।

কর ভিত্তি

আইনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (আয় বা পণ্য বিক্রয়) অথবা অবস্থা (বাড়ি বা অন্য কোন সম্পদের মালিকানা) যার দ্বারা কর প্রদানের দায় সৃষ্টি হয় তাকে কর ভিত্তি বলা হয়। যা কিছু কর আরোপযোগ্য তারই কর ভিত্তি আছে।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা (Purchasing Power Parity-PPP)

এটি একটি তত্ত্বীয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদে বিনিময় হারের সাহায্যে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী বিনিময় হার–ই মূলত ঐ দুই মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হার। পিপিপি (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি) নামে সমধিক পরিচিত, আন্ত:দেশীয় মুদ্রার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপের একটি জনপ্রিয় সূচক। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে এক মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, এক মার্কিন ডলার দিয়ে আমেরিকায় যে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তা ক্রয় করতে বাংলাদেশে কত টাকা বা ভারতে কত টাকা ব্যয় করতে হবে। ধরা যাক, আমেরিকায় এক কেজি চালের দাম পাঁচ ডলার আর বাংলাদেশে এক কেজি চালের দাম ৪০ টাকা। এই হিসাবে পিপিপি অনুসারে ৫ ডলার = ৪০ টাকা। তার মানে এক পিপিপি ডলারের মূল্য হবে বাংলাদেশী মুদ্রামানে (৪০/৫)= ৮ টাকা। বাস্তবে ১ ডলারের বাজার মূল্য ৮০ টাকা। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি একটি জনপ্রিয় অর্থনৈতিক সূচক। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা দেশসমূহের তুলনাযোগ্য জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই সূচকটি

প্রায়শ: ব্যবহার করে থাকে, তবু এর সমর্থনে গবেষণালব্ধ ফলাফল আদৌ নিরঙ্কুশ নয়। গত প্রায় একশ বছরে এ তত্ত্বটি নিয়ে শত শত গবেষণা হলেও নিশ্চিত হওয়া যায় নি যে বাস্তবে এই তত্ত্বটি প্রমাণযোগ্য।

ঘাটতি বাজেট

যে বাজেটে খরচ বেশি আয় কম সেটি ঘাটতি বাজেট। অতীতে ঘাটতি বাজেটকে মনে করা হতো সরকারের দুর্বলতা, ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা। সমসাময়িককালের অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেট কার্যকর ভূমিকা রাখে।

চলতি বাজেট ভারসাম্য

চলতি বাজেট ভারসাম্য বলতে রাজস্ব আয় ও চলতি (রাজস্ব) ব্যয়ের পার্থক্য বুঝায়। চলতি বাজেট ভারসাম্য প্রায়শ সরকারের সঞ্চয়ের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সে সাথে একটি দেশের অর্থনীতির মোট সঞ্চয়ে সরকারের অবদানেরও পরিমাপক। ধরা যায়, কোন দেশের সরকার একটি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে সকল উৎস হতে আয়ের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা এবং চলতি (রাজস্ব) ব্যয়ের পরিমাণ ৩৫০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করেছে। সরকারের মোট রাজস্ব আয় দিয়ে রাজস্ব ব্যয়ের চাহিদা মিটিয়ে আরও ১০০০ কোটি টাকা চলতি (রাজস্ব) ব্যয় বহির্ভূত অন্যান্য ব্যয় মিটারের জন্য ব্যবহার করা যায়। এ ক্ষেত্রে চলতি রাজস্ব আয় দ্বারা চলতি (রাজস্ব) ব্যয় মিটিয়ে যে ১০০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে তাই চলতি বাজেট ভারসাম্য।

চলতি মূল্যে জিডিপি

চলতি মূল্যে জিডিপি বলতে একটি অর্থনীতির মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)কে চলতি বাজার মূল্যেরভিত্তিতে পরিমাপ করাকে বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০১০-১১ অর্থ বছরে কোন একটি দেশের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকর্ম হলো ১ লক্ষ টন চাল ও

২ লক্ষ টন গম। এ বছর চাল ও গমের বাজার টনপ্রতি যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা। তাহলে, চলতি মূল্যে দেশটির মোট জিডিপি'র পরিমাণ = (১,০০,০০০ × ৩০,০০০) + (২,০০,০০০ × ২৫,০০০) = ৮০০,০০,০০,০০০ টাকা (আটশ কোটি টাকা)। এ পরিমাপটিতে দেশের অর্থনীতি সরকার, ফার্ম ও খানার চাহিদা কতটুকু মিটাতে পেরেছে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন অর্থনীতির উৎপাদনের কোন পরিবর্তন না হয়ে দাম দ্বিগুণ হয় তবে চলতি মূল্যে জিডিপির পরিমাণও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এর প্রেক্ষিতে যদি বলা হয় যে ঐ অর্থনীতি চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য দ্বিগুণ হয়েছে তা হবে ভ্রান্তিপূর্ণ, কারণ উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ আগের মতই রয়ে গেছে।

চলতি হিসাব চলতি হিসাব বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের একটি উপাদান। এ হিসাবে পণ্য ও সেবাসমূহের আমদানী ব্যয়, পণ্য ও সেবাসমূহের রপ্তানি আয়, নীট আয় (এক বছরের কম সময় বিদেশে অবস্থানকারী আবাসিকদের বেতন-ভাতা, বৈদেশিক ঋণের সুদ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের লভ্যাংশ) এবং নীট চলতি হস্তান্তর (রেমিট্যান্স, অনাবাসিক, বিদেশী ব্যক্তি ও সরকার হতে প্রাপ্ত উপহার)-এর হিসাবগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চলতি হিসাবের ভারসাম্য = বাণিজ্য ভারসাম্য + নিট সেবা + নিট আয় + নিট চলতি হস্তান্তর।

চলতি হিসাবে ঘাটতি একটি দেশের রপ্তানি ও আমদানির পার্থক্যই হচ্ছে চলতি হিসাবে ঘাটতি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যখন উদ্বৃত্ত থাকে তখন তাকে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত বলে।

চলতি ব্যয় (রাজস্ব ব্যয়) চলতি (রাজস্ব) ব্যয় হলো সরকারের আবর্তক প্রকৃতির চলতি ব্যয়। যা দ্বারা সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

এ ধরনের ব্যয়ের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা, মেরামত ও সংস্কার, ভর্তুকি ও চলতি হস্তান্তর এবং সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ আহরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ সরকারি সংস্থা। দেশের মোট রাজস্বের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা NBR- National Board of Revenue যে সকল কর নির্ধারণ করে, আদায় করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- আয়কর, করপোরেট কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে সকল কর নিয়ন্ত্রণ করে না, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- ভূমি হস্তান্তর কর নিয়ন্ত্রণ করে ভূমি বিভাগ, ঘরবাড়ি জমি-জমার ওপর কর আদায় করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন) ইত্যাদি।

জিডিপি/মোট দেশজ উৎপাদন

জিডিপি/GDP অর্থ Gross Domestic Product বা মোট দেশজ উৎপাদন। কোন দেশের ভেতরে সাধারণত একবছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় ও সেবার যোগান দেয়া হয় তার বাজার মূল্যকে জিডিপি বলে। জিডিপি দু'ভাবে হিসাব করা হয়। এ হিসাবে বিদেশ হতে অর্জিত আয় পরিগণনায় আনা হয় না। জিডিপি হলো সর্বাধিক ব্যবহৃত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দুভাগে পরিমাপ করা হয়। ১. স্থির মূল্যে, ২. চলতি বাজার মূল্যে। আমাদের দেশে ডিজিপি হিসাব করলেও আমেরিকানরা এটিকে জিএনআই মোট জাতীয় উৎপাদন বা Gross National Product (GNP) হিসাব করে।

জিএনআই (মোট জাতীয় আয়)

কোন দেশের জনগণ সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে ও সেবাকর্ম যোগান দেয় তাকে

মোট জাতীয় আয় বা Gross National Income (GNI) বলা হয়। জিএনআই হিসাবের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার দাম হিসাব করা হয়। দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উৎপাদন ও আয় বাদ দেয়া হয়। প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো টাকা (রেমিটেন্স) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের পার্থক্য যোগ করা হয়। ধরা যাক কোন একটি অর্থবছরে একটি দেশের জিডিপির পরিমাণ ৩৫,০০০ কোটি টাকা। ঐ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদেশি নাগরিকদের মোট উপাদান আয় ২,০০০ কোটি টাকা এবং দেশের নাগরিকদের বিদেশ হতে অর্জিত মোট উপাদান আয় ২,৫০০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে ঐ অর্থবছরে দেশটির স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) = ৩৫,০০০ + ২,৫০০–২,০০০= ৩৫,৫০০ কোটি টাকা। যদি ঐ অর্থবছরে দেশটির মোট জনসংখ্যা ৩.৫৫ কোটি হয় তবে সে সময়ে দেশটির মাথাপিছু জাতীয় আয় ১০,০০০ টাকা।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বলতে প্রকৃত জিডিপির বৃদ্ধির হারকে বুঝায়।

থোক বরাদ্দ থোক মানে যার খুচরা হিসাব নাই, বিস্তারিত বিবরণ নাই। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সরকার কিছু টাকা আলাদা করে রেখে দেয় পছন্দমাফিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নানারকম জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, এটাই উন্নয়ন সহায়তা বা 'থোক বরাদ্দ'। এই অর্থের কোন স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা থাকে না। স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা না থাকায় এই টাকা সরকারের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যয় হয়। প্রকৃত উন্নয়নের কাজে না লেগে এই টাকার বড় অংশ প্রধানত অপচয় ও অপব্যবহার হয়।

দায় পরিশোধ অনাদায়ী ঋণ পরিশোধের জন্য আবশ্যক সুদ ও ঋণের আসল টাকার সমষ্টি।

নিরীক্ষা একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, জালিয়াতি ও অদক্ষতা চিহ্নিতকরণ এবং কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

প্রকল্প সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম যা সাধারণ কর্মকান্ডের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং যার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ এবং সম্পদ বরাদ্দ থাকে।

প্রগতিশীল কর এটি এক ধরণের কর নির্ধারণ পদ্ধতি বা কৌশল, যাতে বেশি উপার্জনের জন্য ধনীরা বেশি ট্যাক্স দিবে। ইংরেজিতে এটাকে Progressive tax বলে। আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ট্যাক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আমাদের দেশের বাজেটেও এ ধরনের ট্যাক্স পদ্ধতি চালু রয়েছে। আমাদের দেশে পরোক্ষ করের পরিমাণ অনেক বেশি, মোট করের দুই-তৃতীয়াংশ। যে কারণে, প্রগতিশীল ট্যাক্স পদ্ধতি চালু থাকলেও প্রান্তিক মানুষেরা অনেক বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষ কর দেশের আয়ের সাধারণ উৎস হলো প্রত্যক্ষ কর। যে করের বোঝা করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপাতে পারে না অর্থাৎ করের বোঝা করদাতাকেই বহন করতে হয়, সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন: ব্যক্তির আয়ের ওপর ট্যাক্স (আয়কর), ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর কর (কর্পোরেট আয়কর), দান কর, উত্তরাধিকার কর, ঘরবাড়ি-জমিজমা থাকলে তার উপর কর ও খাজনা ইত্যাদি। এই করের চূড়ান্ত পরিশোধের দায়িত্ব একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের।

পরোক্ষ কর যে করের বোঝা উৎপাদক/সরবরাহকারী/বিক্রেতার পরিবর্তে ভোক্তাকে বহন করতে হয় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন: আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক (মাদক জাতীয় দ্রব্যের ওপর কর), ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর বা

বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এই করের পরিশোধের দায়িত্ব সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে সর্বশেষ কোন ভোক্তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর। যেমন: সাবান কেনার সময় আমরা ভ্যাট দিই। যদি প্রত্যক্ষ কর হতো তাহলে এটা ঐ সাবান কোম্পানির দেয়ার কথা। কিন্তু পরোক্ষ কর বা ভ্যাটের কারণে কোম্পানির এ বোঝা সাধারণ ক্রেতাকে বহন করতে হচ্ছে।

প্রস্তাবিত বা খসড়া বাজেট

সারাবছর ধরে প্রস্তুত হওয়া বাজেট মন্ত্রী পরিষদে পাশ হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী অর্থবছরের শেষ (জুন) মাসের শুরুর দিকে জাতীয় সংসদে যে বাজেট উপস্থাপন করেন তাকে প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট বলে। প্রায় এক মাস ধরে সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের পর ছোটখাট কিছু সংশোধনী সমেত (যদি থাকে) বাজেট পাশ হয়। এই বাজেটই পরবর্তী বছরের জন্য কার্যকর হয়।

পরিকল্পনা কমিশন

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

প্রচ্ছন্ন দায়

প্রচ্ছন্ন দায় অর্থ কোনো সংস্থা অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ঋণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতাজনিত কারণে সরকারের ওপর আরোপিত হতে পারে এমন সম্ভাব্য দায়। প্রচ্ছন্ন দায় দু'ধরণের হতে পারে। নির্দিষ্ট

প্রচ্ছন্ন দায় এবং নিহিত প্রচ্ছন্ন দায়। কোনো চুক্তি বা আইনবলে সংজ্ঞায়িত প্রচ্ছন্ন দায় হচ্ছে নির্দিষ্ট প্রচ্ছন্ন দায়। অন্যদিকে আইনগত প্রেক্ষাপটে নয় বরং জনপ্রত্যাশা ও রাজনৈতিক চাপের কারণে সরকারে ওপর সৃষ্ট প্রত্যাশিত ভারই হচ্ছে নিহিত প্রচ্ছন্ন দায়।

বাজেট

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন। বাজেট যে শুধু সরকার তৈরি করে তা নয়; বাজেট ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী, দেশীয় বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো সংগঠনেরও হতে পারে। পরিবারের উপার্জন অনুযায়ী খরচ মিটানোর জন্য যেমন বাজেট তৈরি করা হয়, তেমনি দেশের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য সরকার বাজেট তৈরি করে থাকেন। দেশের বাজেট এক বছরের জন্য করা হয়ে থাকে।

'জাতীয় বাজেট' হলো, বাংলাদেশ সরকারের এক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবের দলিল। সাংবিধানিক পরিভাষায় এর নাম- "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" বা "Annual Financial Statement"। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট হলো জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত দেশের বাৎসরিক হিসাব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে থাকেন। সংসদে তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার আলোকে যে ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন তা সংশোধনের পর জাতীয় বাজেট সংসদের অনুমোদন লাভ করে।

বাজেটের সংক্ষিপ্ত সার

বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সারে মূলত সরকারের প্রধান প্রধান হিসাবসমূহ যথা সরকারের প্রাক্কলিত রাজস্ব প্রাপ্তি-ব্যয়,

মূলধন প্রাপ্তি-ব্যয়, খাদ্য হিসাব, প্রস্তাবিত ঋণও অগ্রিমের লেনদেনসমূহ এবং ঘাটতি অর্থায়নের উপায়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়।

বাজেট প্রাক্কলন বাজেট প্রাক্কলন হলো একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকারের বিভিন্ন খাত থেকে সম্ভাব্য আয়ের ও বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ধরা হল ১ লক্ষ কোটি টাকা আর সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হল ৯০ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্বৃত্ত হবে ১০ হাজার কোটি টাকা। আবার যদি আয় ধরা হয় ১ লক্ষ কোটি টাকা আর ব্যয় ধরা হয় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা, তাহলে বাজেট ঘাটতি হবে ১০ হাজার কোটি টাকা। বাজেট প্রাক্কলন তৈরি হলে পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট মঞ্জুরি-দাবি আকারে অনুমোদনের জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয়।

বাজেট পরিপত্র অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত দাপ্তরিক নোটিশ; যার মাধ্যমে আসন্ন অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রাক্কলন তৈরি ও জমাদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে আহ্বান জানানো হয়। এ নোটিশে বাজেট ফরম, বাজেট প্রাক্কলন তৈরির নির্দেশনাবলী এবং সংসদে চূড়ান্ত বাজেট উপস্থাপন সহায়ক কর্মকান্ডের একটি ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাজেট ঘাটতি বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয় যতটুকু কম হয় তাই ঘাটতি। যখন সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ সরকার কর্তৃক আহরিত মোট আয়ের চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে বাজেট ঘাটতি বলে। ধরা যাক, কোন দেশের সরকার একটি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে সকল উৎস হতে আয়ের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সব

মিলিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করেছে। সরকারের মোট আয় দিয়ে মোট ব্যয়ের চাহিদা মিটানো সম্ভব নয় বিধায় আরও ৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হওয়ায় এ ধরণের বাজেটকে ঘাটতি বাজেট বলে এবং এ ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা।

বরাদ্দ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে) প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ।

বাজার বাজার হল এমন একটি স্থান যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর নিয়মিত ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে বুঝায়, কোন দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতা ও দামের সমষ্টিগত কার্যক্রম। এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী একটি কর্মব্যবস্থা, যেখানে একটি লেনদেন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে বস্তু বা অন্যকোন কর্মদক্ষতা বিনিময় করে সামগ্রিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে। বাজারের তিনটি অপরিহার্য উপাদান- দ্রব্য, ক্রেতা-বিক্রেতা ও একটি প্রতিযোগিতামূলক দাম যা ক্রেতা-বিক্রেতা মিলে নির্ধারণ করে থাকে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের জন্য আলাদা বাজার গড়ে উঠতে পারে যেমন- পাটের বাজার, স্বর্ণের বাজার, অর্থের বাজার, শেয়ার বাজার।

বাজার অর্থনীতি/ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের (সম্পদ) ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি করায়ত্ব ও বৃদ্ধি করার ইচ্ছাই মানুষের কর্মোদ্যমের মূল উৎস। বাজার তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা,

আয় বৈষম্য, শ্রেণি বিভক্ত সমাজ, চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থা ইত্যাদি।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি হলো প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি; যা বাজেট নামে সমধিক পরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থবিভাগ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি তৈরি করে সংসদে পেশ করে। এ আর্থিক বিবৃতিতে কয়েকটি বিবরণী রয়েছে যা হলো:

বিবরণী ১ সংযুক্ত তহবিল-প্রাপ্তি: অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী সার-সংক্ষেপ

বিবরণী ২ সংযুক্ত তহবিল-প্রাপ্তি: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুযায়ী সার-সংক্ষেপ

বিবরণী ৩ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব-প্রাপ্তি

বিবরণী ৪ সংযুক্ত তহবিল-অনুন্নয়ন ব্যয়: অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সার-সংক্ষেপ

বিবরণী ৫ সংযুক্ত তহবিল-উন্নয়ন ব্যয়: অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সার-সংক্ষেপ

বিবরণী ৬ সংযুক্ত তহবিল-অনুন্নয়ন ব্যয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক

বিবরণী ৭ সংযুক্ত তহবিল-ব্যয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক

বিবরণী ৮ সংযুক্ত তহবিল-উন্নয়ন ব্যয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক

বিবরণী ৯ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব-পরিশোধ

বিবরণী ১০ মঞ্জুরি দাবি

বিবরণী ১১ মঞ্জুরি দাবি ও উপযোজন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হলো সরকার কর্তৃক গৃহীত বার্ষিক বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তামূলক কর্মসূচিসমূহের

(এডিপি) বিবরণ যা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত। এতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়, প্রক্ষেপিত ব্যয়, অর্থায়নের উৎস ইত্যাদিসহ প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র লিপিবদ্ধ থাকে।

ব্যাস্টিক অর্থনীতি ব্যাষ্টিক অর্থনীতি Macro Economics অর্থশাস্ত্রের আরেকটি শাখা। ব্যষ্টিক অর্থনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম এককগুলোর আচরণ ও কার্যাবলী পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে। যেমন- একজন ভোগকারী, একটি পণ্য ইত্যাদি। পরিবার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সীমিত সম্পদ বণ্টনের জন্য কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে তা নিয়ে আলোচনা করে। পণ্য ও সেবার যোগান ও চাহিদাকে যেসব সিদ্ধান্ত ও আচরণ প্রভাবিত করে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করে, যা কিছু মূল্য নির্ধারণ করে এবং মূল্যের পরিবর্তনের ফলে পণ্য ও সেবাসমূহের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। অর্থাৎ ব্যাষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হল, প্রতিটি উৎপাদক, প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য, চাহিদা, যোগান, মজুরি, আয়, প্রতিটি শিল্প, প্রতিটি দ্রব্য।

বাণিজ্য ভারসাম্য বাণিজ্য ভারসাম্য বলতে একটি দেশের আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পার্থক্য বুঝায়। যখন কোন দেশের রপ্তানি আয় সে দেশের আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তখন তাকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বুঝায়, অন্যদিকে যখন কোন দেশের রপ্তানি আয় সে দেশের আমদানি ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তখন বাণিজ্য ঘাটতি বুঝায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য হলো একটি পরিসংখ্যান বিবরণী যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনসমূহের পদ্ধতিগত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৈদেশিক বাণিজ্যের (আমদানি রপ্তানি) লেনদেন মিটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার যে স্থিতি রাখা হয় তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। সাধারণত পরবর্তী তিন মাসের লেনদেন ব্যয় মিটানোর মত অর্থের অতিরিক্ত যে মুদ্রা কেন্দ্রিয় ব্যাংকের তহবিলে থাকে সেটাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

বিনিময় ভারসাম্য দুইটি দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবা লেনদেনের ফলে যে আর্থিক হিসাব উদ্ভূত হয় তার মাধ্যমে ঐ দু'টি দেশের বিনিময় ভারসাম্য বোঝা যায়। এই হিসাবের মধ্যে থাকে আমদানি-রপ্তানির বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ, আর্থিক মূলধন এবং তহবিল স্থানান্তর। এটি সাধারণত এক বছরের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সার-সংক্ষেপ। এটি প্রকাশ করা হয় সেই দেশের স্থানীয় মুদ্রায়। রপ্তানিকারী দেশ এটিকে উদ্বৃত্ত উপাদান এবং আমদানিকারী দেশ ঘাটতি উপাদান হিসেবে হিসাবভুক্ত করে।

বিনিময় হার বিনিময় হার বলতে একটি দেশের মুদ্রার সাথে অন্য একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারকে বুঝায়। বিনিময় হার দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে মূল্যমান পরিমাপ করে। উদাহরণ স্বরূপ, মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার ৮১ টাকা বলতে বুঝায় যে, ১ মার্কিন ডলারের যে মূল্য তা বাংলাদেশী ৮১ টাকার মূল্যের সমান।

ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট যদি কোন অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ অর্থাৎ সরকারের মোট আয় মোট ব্যয়ের সমান হয় তবে এ ধরণের বাজেটকে ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট বলে। উদাহরণ স্বরূপ ধরে নেয়া যায় যে কোন দেশের সরকার একটি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে সকল উৎস হতে আয়ের পরিমাণ ৫,০০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সব মিলিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,০০০ কোটি টাকা

প্রাক্কলন করেছে। সরকারের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান হওয়ায় এ ধরণের বাজেটকে ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট বলে।

ভর্তুকি

বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কোন দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উৎপাদক/ সরবরাহকারী/ বিক্রেতাকে প্রদেয় অর্থ সহায়তাই হলো ভর্তুকি। এটি কোন বিশেষ খাতকে (যেমন কৃষি, কুটির শিল্প) রক্ষা বা উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেয়া। এটা সরাসরি আর্থিক বা নীতি সহায়তা হতে পারে। ট্যাঙ ছাড় বা কাঁচামালের মূল্য কম রেখেও অনেকসময় ভর্তুকি দেয়া হয়। সরকার দেশের কৃষি, শিল্প, জ্বালানির মত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

সরকার তার আয় বাড়ানোর জন্য সেবা, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ওপর 'বিক্রয় কর' আরোপ করে থাকেন। আগে এটাকে টার্নওভার ট্যাক্স বলা হতো, যেখানে পণ্যের উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত মাত্র একবারই বিক্রয় কর পরিশোধ করতে হতো। ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে তৎকালীন সরকার এ পদ্ধতির পরিবর্তন করে পণ্যের উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত যতগুলো হাত বদল হয়ে ক্রেতার কাছে পৌঁছায়, তার প্রতিটি স্তরে বিক্রয় কর ধার্য করে নতুন বিক্রয়কর পদ্ধতির প্রচলন করেন। একে 'ভ্যাট' (VAT) বা ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স অর্থাৎ 'মূল্য সংযোজন কর' বলা হয়।

মূল্যস্ফীতি

স্ফীতি মানে কোন কিছুর বৃদ্ধি বা বেড়ে যাওয়া। মূল্যস্ফীতি মানে মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি মানে মুদ্রা বৃদ্ধি বা মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এর বিপরীত হল সংকোচন। মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি উভয়ের ফলেই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। অর্থ্যাৎ একই পরিমাণ টাকা দিয়ে

আগের চেয়ে কম পরিমাণ পণ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে, এক বছর আগে চালের দাম ছিল প্রতি কেজি ৪০ টাকা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ সমপরিমাণ চাল কিনতে বর্তমানে ১০ টাকা বেশি খরচ হয়। এর অর্থ বর্তমানে টাকার ক্রয়সামর্থ্য কমে গেছে। ঘুরিয়ে বললে চালের বাজারমূল্য বেড়ে গেছে বা সম্পদের বিপরীতে বাজারে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। সরকার সম্পদের তুলনায় অধিক পরিমাণে কাগুজে টাকা ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে মূল্যস্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাজারে চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান কম থাকলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে পণ্য উৎপাদন কম হলে। অবৈধ মজুরদারি ও উৎপাদক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেও মূল্যস্ফীতি ঘটানো হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৭–১০ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি ঘটে। তবে মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল সহ অন্যান্য পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতার ওপর।

মূলধন ব্যয়

মূলধন ব্যয় হলো এমন এককালীন ব্যয় অথবা বিনিয়োগ, যা থেকে এক বৎসরের অধিককাল সুবিধা অথবা সেবা পাওয়া যাবে। অকাঠামো সৃষ্টি/উন্নয়ন যেমন রাস্তা, বিমানবন্দর কিংবা ভবন তৈরিতে মূলধন ব্যয় করা হয়। এমনকি এক বছরের বেশি ব্যবহার করা যাবে এ রকম কারিগরী দ্রব্য, যানবাহন কিংবা যন্ত্রপাতি ক্রয়ও এ ধরনের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মূলধন হিসাব

মূলধন হিসাব হচ্ছে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের একটি উপাদান/অংশ। এ হিসাবের মূল উপাদান হলো মূলধন হস্তান্তরসমূহ, যা সাধারণত কোন বিদেশি সরকার হতে প্রাপ্ত এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য।

মন্দা

মন্দা হলো একটি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনীতির ধীরগতি। দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির পতন হলে বা তা অব্যাহত থাকলে প্রথমে মন্দা ও তারপর ধস দেখা দেয়। ফলে একটা সময়ব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসারতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো

তিন বছর মেয়াদি বাজেট কাঠামো যা সরকারের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে সম্পদের এবং সম্পদের সাথে কর্মকৃতির সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো বা MTBF (Midterm Budgetery Framework) প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে ২০০৫-০৬ সাল থেকে এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন চালু হয়। তখন এমটিবিএফ ছিল ৩ বছর মেয়াদি, ২০১০-১১ সাল থেকে পাঁচবছর মেয়াদি এমটিবিএফ করা হয়। সামস্টিক অর্থনীতির পূর্বাভাস ও সরকারের নীতির সাথে অর্থ বরাদ্দের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী এক বছরসহ মোট পাঁচ বছরের আয়-ব্যয়-ঘাটতি-অর্থায়নের হিসাব ও পূর্বাভাস করা হয় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে। বর্তমানে সব কয়টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্ব-স্ব কাজের পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নির্দেশক নির্ধারণ করে থাকে।

মঞ্জুরি দাবি

মঞ্জুরি দাবি বলতে সংবিধান মতে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়কে বোঝায়, যা মঞ্জুরি দাবি আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোন মঞ্জুরি দাবি উত্থাপন করা যাবে না। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত মঞ্জুরি-দাবি সম্পর্কে সাধারণত একটি পৃথক দাবি পেশ করতে হয়। প্রত্যেক দাবিতে প্রথমে থাকবে প্রস্তাবিত মোট মঞ্জুরির বিবরণ এবং তারপর থাকবে বিভিন্ন দফায় বিভক্ত প্রত্যেকটি মঞ্জুরির অধীনে বিস্তারিত অনুমতি হিসাবের একটি

বিবরণ। প্রত্যেক মঞ্জুরি দাবি মঞ্জুরি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য একটি মঞ্জুরি নম্বর বরাদ্দ করা হয় যাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল বা মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক একটি সাংবিধানিক পদ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ পদে নিয়োগদান করেন। মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করে থাকেন এবং এ হিসাব সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তির দখলে থাকা সকল নথি, বহি, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্টাম্প, সিকিউরিটিজ, মজুত বা অন্য কোন প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকার রাখেন।

মাথাপিছু আয়

কোন দেশের মোট আয়কে (জিডিপি) জনপ্রতি ভাগ করে দিলে যা হয় তাকে মাথাপিছু আয় বোঝায়। জনগণের সর্বমোট ব্যক্তিগত আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মাথাপিছু আয়কে প্রতিবছর টাকার এককে প্রকাশ করা হয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৬০২ মার্কিন ডলার।

মুদ্রানীতি

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সর্বোচ্চকরণ এবং মূল্যস্ফীতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান ও সুদের হারকে প্রভাবিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাই হচ্ছে মুদ্রানীতি। মুদ্রানীতি দু'ধরণের-সম্প্রসারণশীল ও সংকোচনশীল। সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতিতে অর্থ সরবরাহ স্বাভাবিক গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে

সংকোচনশীল মুদ্রানীতিতে স্বাভাবিক গতির চেয়ে ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায়, এমনকি কখনো কখনো সরবরাহ সংকুচিত হয়।

মিশ্র অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্মিলন ঘটিয়ে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- ব্যক্তি স্বাধীনতা, মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন, রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ, সরকারি ও বেসরকারি খাত, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।

মূলধন প্রাপ্তি মূলধন প্রাপ্তি সাধারণ সেসব রাজস্বকে বুঝায় যা সরকার তার পরিসম্পদ বিক্রি করে পায়। যেমন বাংলাদেশ সরকার যদি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর কাছে কোনো একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে তাহলে সরকার সে বাবদ যে অর্থ পাবে তা মূলধন প্রাপ্তি/রাজস্ব হিসেবে হিসাবভুক্ত হবে।

রপ্তানি শুল্ক রপ্তানি পণ্যের ওপর যে শুল্ক বসানো হয় তাই রপ্তানি শুল্ক। রপ্তানি শুল্ক বাড়া কমার ওপর অনেক সময় একটি দেশের রপ্তানির পরিমাণ ওঠা-নামা নির্ভর করে।

রেমিট্যান্স বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা সারাবছর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় দেশে যে টাকা পাঠান তাই রেমিটেন্স। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরাট সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক ও পেশাজীবি কর্মরত আছেন। তারা সারাবছর ব্যাংকের মাধ্যমে বা ডাকযোগে তাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে টাকা পাঠান। রেমিটেন্সের টাকা দেশে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ

হয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের কৃষি ও গার্মেন্টস্ সেক্টরের মতই রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল রাখে। বাংলাদেশের রেমিটেন্স অর্জনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যত বেশি-বিদেশি শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারবো আমাদের রেমিটেন্স তত বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক যত দক্ষ হবে রেমিটেন্সের পরিমাণও তত বাড়বে।

রাজস্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের নিকট থেকে সেবার বিনিময়ে সংগৃহীত রাজস্ব ও ফিস (যেমন, ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি)।

রাজস্ব আয় কর, লেভি বা শুল্ক অথবা এ সম্পর্কিত অন্য কোন চার্জ এবং কর বহির্ভূত অন্যান্য খাত হতে সংগৃহীত অর্থ যা সংযুক্ত তহবিলে জমা হয় তাকে রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজস্ব আয় দু'ধরণের: কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর রাজস্বের সিংহভাগ যেমন, আয়কর, বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, ইত্যাদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায় হয়ে থাকে।

রাজস্ব ব্যয় অনুন্নয়ন বাজেট দেখুন।

রাজস্ব ঘাটতি রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে রাজস্ব ব্যয় বেশি হলো রাজস্ব ঘাটতি। এটি সরকার বর্তমান ব্যয়ের ওপর বর্তমান আদায়ের সাময়িক পতন। রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব আয়ের জন্য একটি লক্ষ্য ঠিক করে থাকে, বছরের কোন সময়ের মধ্যে কত রাজস্ব আয় করা হবে সেই মোতাবেক সরকারের ব্যয়ের পরিকল্পনা থাকে। কোন সময় রাজস্ব আয়ের লক্ষ পূরণে ব্যর্থ হলে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়।

রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যাবস্থার মাধ্যমে

জাতির সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের রাজস্ব আহরণ, ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিই হলো রাজস্ব নীতি। জাতীয় বাজেট হলো এই নীতি বাস্তবায়নের প্রধানতম হাতিয়ার।

রিজার্ভ মুদ্রা রিজার্ভ মুদ্রা হলো ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত নগদ মুদ্রা, ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ খাতের আমানতের সমষ্টি। রিজার্ভ মুদ্রা কখনো কখনো উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা, ভিত্তি মুদ্রা বা মনিটারি ভিত্তি হিসেবেও পরিচিত।

সম্পদ (সরকারি) সম্পদ বলতে ঐ সব বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, যার ওপর সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যার নির্দিষ্ট মূল্য আছে।

সম্পূরক বাজেট বাৎসরিক বাজেটে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা বাজেট থাকে। অনেক সময় মন্ত্রণালয় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের চাইতে বেশি টাকা ব্যয় করে ফেলে; তখন অতিরিক্ত খরচের জন্য একটি বাজেট দেয়া হয়, এটাই সম্পূরক বাজেট। ধরা যাক, একটি অর্থবছরে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাজেট ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। দেখা গেল, উপরে বর্ণিত কারণে অনুমোদিত বাজেটের চেয়ে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে এ অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকা সম্পূরক বাজেট হিসেবে গণ্য হবে।

সম্পূরক শুল্ক বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে করের অসমতা দূর করার জন্য যে কর আরোপ করা হয় তাই সম্পূরক শুল্ক। আমাদের দেশে সাধারণত স্বল্প মূল্যের বিদেশি পণ্যের হাত থেকে দেশি পণ্যকে রক্ষা করার জন্য আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে এক উচ্চতর মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য উৎপাদন করবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল– সম্পদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ, সুষম উন্নয়ন, ভোগের জন্য উৎপাদন, সম্পদের সুষম বণ্টন, বেকারত্বের অবসান, মৌলিক চাহিদা পূরণ।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা আইনগত এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াদি, যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপন করে। এ ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো হলো বাজেট পরিকল্পনাকরণ ও প্রস্তুতকরণ, পাবলিক একাউন্টিং, ট্রেজারি পরিচালনা, অডিটিং ও রিপোর্টিং, কর নীতি ও কর প্রশাসন ইত্যাদি। এতে নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে দক্ষতার সাথে সরকারি অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সরকারি বাজেট একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য সরকারের প্রাক্কলিত আয় এবং ব্যয়ের বিবৃতি সংবলিত তথ্যাদির সমষ্টিই হলো সরকারি বাজেট। বাংলাদেশে অর্থবছর জুলাই মাসে শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের জুন মাসে শেষ হয়।

সরকারি ঋণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত মোট ঋণ।

সরকারি খাত জাতীয় অর্থনীতির একটি অংশ যাতে বৃহৎ পরিসরে সরকারের সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং সরকারি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত।

সংশোধিত প্রাক্কলন কোনো সম্পূরক মঞ্জুরি, সমর্পণ বা উপযোজনের জন্য বাজেট প্রাক্কলনে সমন্বয় করাকে সংশোধিত প্রাক্কলন হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংশোধিত বাজেট অর্থমন্ত্রী নতুন বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংসদে উপস্থাপনের সময় চলতি অর্থবছরের একটি সংশোধিত বাজেট সংসদে উপস্থাপন করেন। বিগত অর্থবছরে যে প্রস্তাবিত বাজেটটি পাশ হয় চলতি অর্থবছরে তার আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক সময় অর্জিত হয় না, আবার অনেক সময় লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া বাজেট যেহেতু জুন মাসে উপস্থাপন হয় সে কারণে জুন মাসের হিসাব হাতে থাকে না। ফলে বিগত ১১ মাসের (জুলাই থেকে মে) হিসাব বিশ্লেষণ করে জুন মাসের জন্য একটি আনুমানিক আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই সকল হিসাব একত্রিত করে চলতি বছরের একটি সংশোধিত বাজেট তৈরি করা হয় এবং তা সংসদে পাশ করিয়ে নেয়া হয়, এটাই সংশোধিত বাজেট।

সামষ্টিক অর্থনীতি আধুনিককালে অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়। এর একটি হল ব্যাষ্টিক অর্থনীতি আরেকটি সামষ্টিক অর্থনীতি। সামষ্টিক অর্থনীতি বা Macro Economics হচ্ছে, অর্থনীতির দুইটি সাধারণ মূল ক্ষেত্রের একটি। যে শাখা অর্থনীতিশাস্ত্রকে একটি সামগ্রিক বিষয় ধরে আলোচনা করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এককের আচরণ বিশ্লেষণ না করে গোটা অর্থব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে তাই নিয়ে আলোচনা করে। এটি জাতীয় বা আঞ্চলিক অর্থনীতির সামগ্রিক কর্মদক্ষতা, কাঠামো ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। সামষ্টিক অর্থনীতিবিদগন পুরো অর্থনীতি কর্মকান্ড বোঝার জন্য জিডিপি, মোট বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের হার, বেকারত্ব ও মূল্য সুচকের মত সামগ্রিক নির্দেশক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

সুষম বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ বাজেটকেই সুষম বাজেট বলে। সুষম বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান হয় অর্থাৎ মোট রাজস্ব আয় দিয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিটানোর পর সরকারের হাতে বাড়তি কোন টাকা থাকে না এবং তার কাছ থেকেও কেউ কোন টাকা পায় না। সুষম বাজেট সচরাচর দেখা যায় না।

স্থিরমূল্যে ডিডিপি একটি ভিত্তি বছরের দাম মাথায় রেখে জিডিপি হিসাব করা হলে তাকে স্থির মূল্যে জিডিপি বলে। ধরা যাক, এক মণ ধানের দাম ২০০১-০২ বছরে ২০০ টাকা ছিল এবং ঐ বছর ১০০ মণ ধান উৎপাদিত হয়েছে। তাহলে ঐ বছর ধানের মোট মূল্য ছিল (১০০x২০০) = ২০,০০০ টাকা। এখন ২০১১-১২ বছরে ধরা যাক ১৫০ মন ধান উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে স্থির মূল্যে ধানের দাম হবে (১৫০x২০০)= ৩০,০০০ টাকা। এভাবে ভিত্তি বছর অর্থাৎ ২০০১-০২ বছরের হিসাবে ২০১১-১২ বছরের উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার মূল্য হিসাব করা হলে তাকে স্থির মূল্যে জিডিপি বলে। এ পরিমাপে ভিত্তি বছরের মূল্য ব্যবহার করা হয় বলে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিডিপির পরিমাণ বাড়বে। কারণ এ পরিমাপে মূল্যস্ফীতির কোন প্রভাব থাকে না। প্রকৃত আয় জানার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিমাপ।

হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসাব নিয়ন্ত্রক হলেন সরকারের হিসাবসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কর্মকর্তা; তিনি সরকারের মাসিক হিসাব বিবরণী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন প্রদান, সকল হিসাব অফিসসমূহের হিসাব পরিচালন এবং সরকারের অর্থ ও মঞ্জুরি হিসাব প্রস্তুত করে থাকেন।

বাজেট প্রকাশনা

জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাজেট ডকুমেন্টস্ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনকালে এসব দলিল বিতরণ করা হয়। এছাড়া, অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.mof.gov.bd) সেগুলো প্রকাশ করা হয়। বাজেট প্রকাশনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. বাজেট বক্তৃতা: এটা মূলত সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলের বিবরণ সংবলিত একটি প্রকাশনা। এতে একদিকে থাকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, গত এক বছরে সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দের তথ্যাদি। অন্যদিকে, রাজস্ব আহরণ বিষয়ে সরকারের গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহের তথ্যাদিও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. বাজেটের সংক্ষিপ্তসার: এই প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় পরিকল্পনা, ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি: এতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সরকারের আয় এবং উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়। একই সাথে বিগত অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত প্রাক্কলন সম্পর্কেও উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়।

৪. মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি: এ প্রকাশনায় মধ্যমেয়াদি কৌশল, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন এবং লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণিত থাকে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির দৃশ্যকল্প সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তুলে ধরা হয়। এছাড়া রাজস্ব আয়, সরকারি ব্যয়, ঋণ ও অগ্রাধিকার খাতের ব্যয় পরিস্থিতিসহ প্রক্ষেপণ এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৫. জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট: এ রিপোর্টে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যাসহ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়।

৬. সংযুক্ত তহবিলপ্রাপ্তি: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিপরীতে সংযুক্ত তহবিলে প্রাপ্ত সকল আয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা। এ ছাড়াও আয়ের সারসংক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রধানত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের প্রবণতা, উন্নয়ন নীতিমালা, কৌশল এবং বিভিন্ন খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশন করা হয়।

জনঅংশগ্রহণমূলক ও বাজেট বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন:

১. গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, জাতীয় কনভেনশন ২০১০ প্রকাশনা, 'সবার জন্য বাজেট সবাই মিলে বাজেট' জাতীয় বাজেটের গণতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গ।

২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (২০০২), জেলায় জেলায় সরকার: স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি পর্যালোচনা।

৩. আকবর আলী খান, সমুন্বয় প্রকাশনা (২০০৮), বাংলাদেশের বাজেট প্রক্রিয়ায় গণমানুষের অংশীদারিত্ব: কতিপয় নীতিমালা সংস্কারের অন্বেষা।

৪. আকবর আলী খান, পরার্থপরতার অর্থনীতি।

৫. বদিউল আলম মজুমদার, আগামী প্রকাশনী (২০০৯), স্থানীয় সরকার: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

৬. গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, বাজেট এনসাইক্লোপিডিয়া (২০১৫)